মার্চ ২০২৫ ■ ফাল্গুন– চৈত্র ১৪৩১

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000
Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250
Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200
Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800
Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপস-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh
Quarterly

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২৫ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩১

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৬ই মার্চ ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'রাইট টু ফ্রিডম'- এর প্রেসিডেন্ট William B Milan এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর Jon Danilowicz-কে জুলাই অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়ালচিত্রের ওপর প্রকাশিত 'ART OF TRIUMPH' বই উপহার দেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগঃ সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাস। এ মাসের ২৫শে মার্চ ও ২৬শে মার্চ জাতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য দিন। ২৬শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস। বাঙালির জাতীয় জীবনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ প্রথম প্রহরে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর মাধ্যমে ঢাকাসহ বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এক রাতেই প্রায় ৭ হাজার মানুষ ব্যক্তি পরিচয় হারিয়ে হয়ে ওঠে লাশ। কালরাত্রির এ গণহত্যাকে স্মরণ করে ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে দেশে।

স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণ, ২ লক্ষ মা-বোনের ত্যাগ এবং অগণিত মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক, গণহত্যা ও ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবস নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। মহান মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও বীরত্বগাথাসহ একাধিক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রয়েছে এ সংখ্যাটিতে।

মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর মার্চ মাসে। রমজানের ফজিলত, গুরুত্ব, রোজার তাৎপর্য ও জাকাত নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

এছাড়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের গল্প, কবিতাসহ অন্যান্য নিয়মিত বিষয় দিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* মার্চ সংখ্যাটি। আশা করি, সকলেরই ভালো লাগবে। সবাইকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা।

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ ৪

স্বাধীন বাংলা বেতার এবং দুঃসাহসের সীমা ৬
ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্বাধীনতা ও আত্মসত্তা ১০
ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ইপিআর বাহিনীর অবদান ১২
ড. মো. নাজমুল হক

বাংলাদেশে গণহত্যা: বিদেশিদের চোখে ১৭
খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা

মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমাত্রিক অবদান ২৩
ড. আফরোজা পারভীন

মুক্তিযুদ্ধে সংগীত বিপ্লব ২৮
সাঈদ সাহেদুল ইসলাম

মাসুদুল আলম খান চান্দু ৩১
মিয়াজান কবীর

ডাকটিকিটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ৩৩
ড. মোহাম্মদ আলী খান

মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন (সেক্টর) ৩৭

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৪১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস জুলাই বিপ্লবে নারী যোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় অবদান ৪২

অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫ ৪৫

রমজানের তাৎপর্য ও শিক্ষা ৪৬
মুহাম্মদ ইসমাঈল

জাকাত অর্থনীতির স্বরূপ ও ভূমিকা ৫০
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

ঈদ-উল-ফিতরের পুরস্কার: রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে সম্প্রীতির সেতু ৫২
খান চমন-ই-এলাহি

পানিই জীবন, জীবনই পানি ৫৫
আলেয়া রহমান

বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ ৫৭
জান্নাতুল ফেরদৌস

ভোক্তা অধিকার আদায়ে জরুরি সচেতনতা ৫৯
সাবিহা সুলতানা

গল্প:

হে বৃক্ষ ৬১
ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

একাত্তরের আগন্তুক ৬৫
সুজন বড়ুয়া

শরণার্থী শিবির ৭৪
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ: ৭২-৭৩, ৭৮-৭৯

কাদের বাবু, এস ডি সুব্রত, আতিক রহমান, মোল্লা আলিম, বিজন বেপারী, কাব্য কবির, মো. তাইফুর রহমান, নাটু বিকাশ বড়ুয়া, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, মিজানুর রহমান, সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম, এম. আলমগীর হোসেন, আহসানুল হক, আলমগীর কবির, আব্দুল আওয়াল রণী

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন সেক্টর কমান্ডার কে এম শফিউল্লাহ ৮০

২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৫' প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ

অনুষ্ঠানের সভাপতি, সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অতিথিবৃন্দ, এক্সিলেন্সিস অ্যান্ড মাই লিটল ফ্রেন্ডস হু গেভ মি গ্রিটিংস। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম।

শুরুতে যারা আজ পদক পেয়েছেন তাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য, যারা অলিম্পিয়াডে পুরস্কার পেয়েছ তাদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়।

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এই আন্দোলন বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য সূচিত হলেও এর মূল চেতনাটি ছিল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তা ছিল বাংলায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন, তাই বাঙালির কাছে একুশ মানে মাথা নত না করার দৃঢ় প্রত্যয়। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি তাই শুধু বেদনার্ত অতীতকে স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জনের দিন নয়, বরং এক অবিনাশী প্রেরণা, সকল ধরনের অন্যায়, অবিচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বীজমন্ত্র।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি এনে দিতে আমাদের আত্মত্যাগ করতে হয়েছে অনেক। মাতৃভাষার জন্য জীবনদানের এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষার চেতনা ও মর্যাদা রক্ষার প্রেরণা ও এ চেতনার সাথে প্রাতিষ্ঠানিকতার সূত্রে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও গবেষণার ইতিবৃত্তকে লক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তার যাত্রা শুরু করে।

মাতৃভাষা যে-কোনো নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বাহক। মাতৃভাষার সঙ্গে সকল মানুষের আত্মার সম্পর্ক। মাতৃভাষার পর মানুষ যত ভাষাই আত্মস্থ করুক না কেন, সেসব নতুন ভাষায় যতই পারদর্শিতা অর্জনই করুক না কেন, মাতৃভাষাকে তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে সরাতে পারে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে নানা দেশের নানা ভাষার কিংবা হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কিছু মানুষ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করেন। নতুন দেশের ভাষা তাদের দৈনন্দিন জীবনে চব্বিশ ঘণ্টার ভাষায় পরিণত হয়ে যায়, কিন্তু তবু সে ভাষা মাতৃভাষায় পরিণত হয় না। তারা নিজেদের মধ্যে একত্র হলেই

উৎসাহ সহকারে নিজেদের মূল ভাষায় ফিরে যায়, তাদের মূল ভাষার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নেয় নিজেদের অজান্তেই।

যেসব শহরে তাদের মাতৃভাষাবাসীর সংখ্যা বেশি তাদের শহরের মেয়র, সিটি কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনায়াসে নির্বাচিত হয় তারা। তাদের শহরে তারা নিজেদের মাতৃভাষা নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। তাদের মাতৃভাষায় সরকারি দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করে, তাদের ভাষাভাষী পুলিশ শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে। অথচ শহরের গণ্ডি ছাড়ালেই তারা আবার তাদের নতুন ভাষায় সাবলীলভাবে ফিরে যায়। শহরের নতুন নাগরিকদের নিয়ে পুরানো নাগরিকদের মনে কোনো ক্ষোভের সৃষ্টি হয় না।

একটি নতুন ভাষা শিখলেই পুরানো ভাষায় দুর্বল হয়ে পড়বে এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। পৃথিবীর বহু দেশে একই নাগরিক সাবলীলভাবে কয়েকটি ভাষায় কথা বলবে এটা খুবই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। তারা শৈশব থেকে নানা ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। স্কুলে পড়ার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে অন্তত একটি ভিন্ন ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়। ছাত্ররাও আনন্দ সহকারে সেটা করে থাকে। ইংরেজি শিখলেই বাংলা ভুলে যেতে হবে এরকম কোনো চিন্তা তাদের কারও মাথায় আসে না।

আমরা দ্রুত গতিতে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে যাচ্ছি। এর জন্য মূলত নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রধানত দায়ী। প্রযুক্তির প্রাধান্যের সঙ্গে আসে ভাষার প্রাধান্য। যে দেশের প্রযুক্তি পৃথিবীতে প্রাধান্য অর্জন করতে থাকবে তার সঙ্গে প্রাধান্য অর্জন করতে থাকবে প্রযুক্তিদাতা দেশের ভাষা। সারা পৃথিবী এই ভাষা শেখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

স্পুটনিক যখন মহাকাশে উড়ল সারা পৃথিবী রাশিয়ান ভাষা শেখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে স্কুলে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাশিয়ান ভাষা শেখানো হয় না সে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। যে মাত্র চীন প্রযুক্তিতে এগিয়ে আসল চীনা ভাষা শেখার ঘুম লেগে গেল। যে দেশ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবে পৃথিবী সে দেশের ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়বে– এটাই নিয়ম। যে দেশের কিছু দেবার নেই সে দেশের ভাষাতেও পৃথিবীর আগ্রহ নেই অথবা থাকলেও নিম্ন পর্যায়ে থাকবে। প্রযুক্তি ছাড়াও যে-কোনো দিক থেকে একটি জাতি নেতৃত্ব দিতে পারলে সে দেশের ভাষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়বেই সে ভাষা যত জটিলই হোক না কেন। জাতি এগুলে ভাষা এগোয়। ভাষার সম্মান বাড়ে। নিজ ভাষায় নিবেদিতপ্রাণ প্রচারকর্মী হওয়া সত্ত্বেও জাতির কাছ থেকে পৃথিবীর ভাণ্ডারে কিছু দেবার না থাকলে ভাষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্য, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান সরাসরিভাবে জড়িত। আমরা যখন মাতৃভাষায় কথা বলি তখন যেন মনে রাখি মাতৃভাষা মানুষের প্রাথমিক ভাষা। সেই ভাষা প্রথম শ্রবণে যতই রুঢ় মনে হোক না কেন তা একদিন তার প্রাথমিক জয় পার হয়ে বহু দেশের বহু মানুষের অত্যন্ত নমস্য ভাষায় পরিণত হতে পারে। যদি সে ভাষা পৃথিবীর অগ্রযাত্রায় স্ট্রেটেজিক বা কৌশলগত ভূমিকা দখল করে নিতে পারে।

২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৫' প্রদান অনুষ্ঠানে ফটোসেশনে অংশ নেন- পিআইডি

আজ আমরা মাতৃভাষা দিবসে সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। আবেগের কারণ তো আছেই, মস্ত বড়ো স্বার্থের কারণও আছে। এখন আমাদের জানা নেই কোন অজ্ঞাত নামহীন মাতৃভাষা পৃথিবী সম্পূর্ণ বদলে দেবে। কোন সম্ভাবনাকে অবজ্ঞা করলে মস্ত বড়ো ভুল করব।

আজ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

স্বাধীন বাংলা বেতার এবং দুঃসাহসের সীমা

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

যে কেউ বলবেন যে একাত্তরের যুদ্ধের অনেক বৈশিষ্ট্যের ভেতর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দুটি; স্বতঃস্ফূর্ততা এবং দুঃসাহসিকতা। এই দুটি গুণই দেখতে পাওয়া যায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সেই তরুণদের ভেতরে। তরুণরা দুঃসাহসী হয়, হতে পারে; তাদের ভেতর স্বতঃস্ফূর্ততাও থাকে। কিন্তু যে দশজন তরুণ একত্র হয়েছিলেন বেতার কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও দুঃসাহসের উৎস ছিল অভিন্ন, সেটা হলো দেশপ্রেম।

উদ্যোগটা প্রথমে নিয়েছিলেন তিনজন। পরস্পরের পরিচিত বন্ধুই বলা চলে, বেতারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনজনই। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে। একাত্তরের ২৬শে মার্চের বিধ্বস্ত ও ভয়ংকর সকালবেলাতে তাঁরা ভাবছিলেন কী করা যায়। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে ব্যবহার করে স্বাধীনতার কথা প্রচার করা যায় কি না– এ চিন্তা তাঁদের মাথায় এসেছিল। কিন্তু কেন্দ্রটি শহরের একেবারে ভেতরে। পাকিস্তানি হানাদাররা সহজেই আক্রমণ করতে পারবে এই বিবেচনা থেকে শহরের বাইরে কালুরঘাটে গিয়ে সেখানকার ট্রান্সমিটারটি ব্যবহার করবেন বলে ঠিক করেন। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। ছিল অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ংকর দুঃসাহসিক। কী ঘটতে যাচ্ছে- তা জানা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ তখন শুরুই হয়নি। কোথাও বিদ্রোহের কোনো ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা ছিল না। সবটাই ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তিকর। এরই ভেতর তাঁরা নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বেতার কেন্দ্র চালু করবেন। অন্য কয়েকজন এসে যোগ দিয়েছিলেন; কর্মীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ। তবে তাঁরা যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজ করতে যাচ্ছেন, সেটা তাঁরা জানতেন।

কী প্রচার করবেন সে বিষয়ে মোটেই পরিষ্কার ছিলেন না তাঁরা। সবটাই ছিল অগোছালো। আসলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোটা ব্যাপারটাই ছিল অত্যন্ত অগোছালো। পূর্বপরিকল্পনা ছিল না, প্রস্তুতিও ছিল না। প্রতিরোধ যা ঘটেছে তার সবটাই স্বতঃস্ফূর্ত ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন। লোকে ব্যারিকেড তৈরি করেছে, অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে, ক্যান্টনমেন্ট কাছে থাকলে সেদিকে ছুটে গেছে, গ্রামের মানুষ শহরত্যাগী মানুষদেরকে সাহায্য করেছে; এবং কেউই ভেবে পায়নি ঠিক কী করতে হবে। ব্যর্থতা ছিল নেতৃত্বের। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো প্রকার কর্তব্যনির্দেশ ছিল না। স্থানীয় নেতারা ছিলেন বিভ্রান্ত, তাঁরা অনেক কিছু করবেন ভেবেছেন; কিন্তু কীভাবে করবেন, কোনটা আগে কোনটা পরে, কাকে দিয়ে কোন কাজ হবে এসব ঠিক করতে পারেননি। ৭ই মার্চের পর থেকে বেতারের কর্মীরা 'রেডিও পাকিস্তান' নামটি ফেলে দিয়ে স্থানীয় বেতার কেন্দ্র বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিলেন। নির্দেশ পেলে তাঁরা হয়ত আরও এগুতেন; কিন্তু নির্দেশ আসেনি।

কালুরঘাটে তাঁরা বেতার কেন্দ্র চালু করেছিলেন, কারও কাছ থেকে কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ পাননি; ঘরসংসার আত্মীয়স্বজন ছেড়ে দিয়ে তাঁরা চলে এসেছিলেন ভেতরের তাড়নাতে। স্বতঃস্ফূর্ততার ভেতর যে অগোছালোপনা থাকে সেটা তাঁদের কাজের মধ্যে ছিল। তবে তাঁদের ওপরে যে কর্তৃত্ব করবার মতো কেউ ছিল না সেটার সবটাই যে ছিল অসুবিধার ব্যাপার তাও কিন্তু নয়, তার একটা ভালো দিকও ছিল। তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছেন। পরবর্তীতে তাঁদের এই স্বাধীনতাটা খর্ব হয়েছে। প্রথমে খর্ব করেছেন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত সরকারি কর্তৃপক্ষ, পরে সরাসরি না হলেও চোখ রেখেছে ভারত সরকার। ভারত সরকারের একজন পরামর্শদাতা বেতার ভবনে এসে অনুষ্ঠানসূচি দেখতেন, পরামর্শ দিতেন, এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ঢাকায় বেতার ভবনে চলে এসে সাময়িকভাবে অফিস পর্যন্ত খুলেছিলেন। সেটাও ঘটেছে পরামর্শ দেবার প্রয়োজনেই।

আওয়ামী লীগের হস্তক্ষেপটা ছিল আরও স্পষ্ট। চট্টগ্রামে থাকতে তাঁদের এক নেতা নিজের কণ্ঠে স্বাধীন বাংলা বেতারে ঘোষণা প্রচার করে গেছেন, কিন্তু বেতারের কর্মীরা কোথায় থাকবেন, কীভাবে থাকবেন সে নিয়ে কোনো প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পরে অবশ্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করেছেন যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাকি তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেতার কেন্দ্রটি যখন কলকাতায় চলে গেছে তখন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নানাভাবে হস্তক্ষেপের চেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধটাকে জাতীয় যুদ্ধ হিসেবে না দেখিয়ে আওয়ামী লীগের একক নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ হিসেবে প্রচারের কথা বলা হয়েছিল। বেতার কর্মীদের আপত্তির দরুন সেটা করা সম্ভব হয়নি। কথিকা প্রচারকদের তালিকা এবং কথিকার পাণ্ডুলিপি পূর্ব-অনুমোদনের প্রথাটা অবশ্য চালু করা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধটা ছিল প্রকৃত অর্থেই জনযুদ্ধ। কিন্তু জনযুদ্ধ শব্দটির ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। অজুহাত এই যে শব্দটি মাও সে তুঙ ব্যবহার করতেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' নামে একটি সিগনেচার টিউন ব্যবহার করা হতো। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেটা এসেছিল। নভেম্বরের দিকে, যুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পরিণতির অভিমুখে এগুচ্ছে তখন, সেটা বাদ দিয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' ব্যবহার করার নির্দেশ এসেছিল। আগের গানের আপত্তির কারণ ছিল এই যে, ওর শেষ পঙ্‌ক্তি ক'টি ছিল এই রকমের : 'ভুখা আর বেকারের মিছিলটা যে ঐ/ দিন দিন শুধু বেড়েই যাবে/ রোদে পুড়ে জলে ভেসে অসহায় হয়ে/ ফুটপাথে তারা ঠাঁই পাবে।' দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে এসময়ে এসব অলক্ষণে কথা কেন, তাও আবার স্বাধীন বাংলা বেতারে? চলবে না, চলেনি।

চরিত্রগতভাবে যুদ্ধটা জনযুদ্ধ হলেও এতে সকলের অংশ গ্রহণের কিন্তু সুযোগ ছিল না। যে দশজন দুঃসাহসী তরুণ যোদ্ধা বেতার কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের কারোই কোনো দলীয় পরিচয় ছিল না। তাঁরা আওয়ামী লীগের ছিলেন না, বামপন্থি দলগুলোর কোনোটির সঙ্গেই তাঁদের সংশ্রব ছিল না। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগ না-থাকাটা তবু যা হোক সহনীয় ছিল, বামপন্থার দিকে ঝোঁক যদি কারো ব্যাপারে সত্য হতো তবে তিনি অসুবিধায় পড়তেন। অন্ততপক্ষে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হতো, যেমন হয়েছিল মোজাফ্ফর ন্যাপের কর্মীদেরকে। তাঁদের পাঁচশো কর্মী আগরতলায় অপেক্ষায় ছিলেন, প্রশিক্ষণ নেবেন এবং যুদ্ধে যাবেন এ আশায়। কিন্তু প্রশিক্ষণের জন্য তাঁরা গৃহীত হননি। পরে তাঁদেরকে স্বতন্ত্র ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ যেটুকু পান তাও স্বতন্ত্রভাবে। আর সেটাও সম্ভব হয়েছে সিপিআই-এর সহযোগিতার কারণে; সিপিআই-এর পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল। জনযুদ্ধ হবার কারণেই যুদ্ধটার চরিত্র দাঁড়াতে পারত জাতীয় মুক্তির সর্বদলীয় সংগ্রামের। সেই চরিত্র যদি স্বীকৃতি পেতো তবে তার প্রতিফলন ঘটত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠানেও, এবং অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি সৃষ্টিশীল হতো, তারা আরও ব্যাপক উদ্দীপনা ও আশা-ভরসা সৃষ্টি করতে সমর্থ হতো। দুর্ভাগ্যক্রমে তেমনটা ঘটেনি। কেন যে ঘটলো না তার একটি উল্লেখ বেলাল মোহাম্মদের বই *'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'*তে পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের ভেতর বেলাল মোহাম্মদই ছিলেন সবচেয়ে এগিয়ে। তাঁর বইতে বলা হচ্ছে যে, বামপন্থি নেতাদের একাংশ চেষ্টা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ঐক্য গড়বার পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বামপন্থিরা সকলকে মিলে একটি ঐক্যফ্রন্টে মিলিত করতে। কিন্তু জানা গেছে যে, চীনপন্থিদের সঙ্গে ঐক্যফ্রন্ট গড়তে মণি সিংহ রাজি হননি। 'কারণ তাতে দেবীর সায় নেই।' বোঝাই যাচ্ছে দেবী হচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী। তবে এটা জানি যে শেষ পর্যন্ত একটি পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয়েছিল, যার সভাপতি করা হয়েছিল মওলানা ভাসানীকে; কিন্তু পরিষদের একটির অধিক বৈঠক বসেনি, এবং দায়সারা গোছের পরিষদটি গঠনের পেছনে হয়ত সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শ কাজ করেছিল। ভারতের কংগ্রেস সরকার এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ, উভয়েরই ভয় ছিল বামপন্থিরা ঢুকে পড়লে নেতৃত্ব বামপন্থিদের হাতে চলে যাবে। সে ভয় আওয়ামী লীগের যে ছিল ন– তা নয়। মুজিববাহিনী অকারণে গঠিত হয়নি।

স্বাধীনতা পেলে উদ্ভাবনীশক্তি কেমন বিকশিত হতে পারে সেটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মীদের কাজের ভেতর সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। নিজেদের কর্মস্পৃহার বাইরে তাঁদের জন্য কোনো বস্তুগত সমর্থন ছিল না। বেতারের ব্যাপারে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা সেটাও ছিল পাকিস্তানি বেতার কেন্দ্রে কাজ করারই। তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন পাকিস্তানি চিন্তাধারার প্রচারে। হঠাৎ করেই তাঁদেরকে অবস্থান নিতে হয়েছিল সম্পূর্ণ উল্টো। এরই মধ্যে তাঁরা দ্রুত গতিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং সেসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন। যেমন নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে। কোথা থেকে প্রচার হচ্ছে শত্রুপক্ষ সেটা যেন না জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার হবে। শুরুতে একজন মহিলা ঘোষিকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁকে তাঁরা সঙ্গে নিতে পারেননি; পাছে রক্ষণশীল শ্রোতারা বিরূপ হয়। সম্প্রচার কেন্দ্রটি ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। রক্ষার ব্যবস্থা

করার জন্য ২৭ তারিখেই তাঁরা পটিয়াতে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে গিয়ে সহায়তা চেয়েছিলেন। মেজর জিয়া ইতোমধ্যেই তাঁদের অনুষ্ঠান শুনেছেন; তাই তাঁদেরকে পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। নিজ বাহিনীর কিছু সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছেন কালুরঘাটে। ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে, পাহারার ব্যবস্থাও করা গেছে। বেলাল মোহাম্মদ দেখলেন যুদ্ধটা যেহেতু সশস্ত্র তাই সেনাবাহিনীর কাউকে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করলে ভালো হয়। মেজর জিয়াকে তিনি বলেছিলেন, আমরা তো সবাই মাইনর, মেজর হিসেবে আপনিই বরঞ্চ স্বকণ্ঠে কিছু বলুন। তাঁর বলার ভেতর কিছুটা কৌতুক ছিল, জিয়া কথাটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে নিজের হাতে লিখে, নিজের পরিচয় দিয়ে, স্বকণ্ঠে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। কথাগুলো তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন, এবং নিজের নামেই ঘোষণা দিতে চেয়েছিলেন। বেলাল মোহাম্মদের পরামর্শে on behalf of our great national leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman যোগ করে দিলেন। সেটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংশোধন। পরে বক্তব্যটি বাংলা অনুবাদ প্রচার করা হয়েছে। সংবাদ বুলেটিনেও কাভারেজ দেওয়া হয়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের বিবৃতি হিসেবে। ঐ বিবৃতি ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। প্রতিক্রিয়া ঘটেছে বৈদ্যুতিক। সবাই যে শুনতে পেয়েছে তা নয়, কিন্তু যারা শুনেছে তাদের কাছ থেকে অন্যরা শুনেছে। জনে জনে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিদেশি বেতারেও সেটি প্রচার পেয়েছে। বিদেশে বাঙালিরাও জানতে পেরেছে। বিলেতে মেজর জিয়াকে কেউ কেউ মেজর জিয়া খান বলেও মনে করেছে। সর্বত্র আশার সঞ্চার হয়েছে। প্রতিরোধ জোরদার হয়ে উঠেছে।

স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনার আরও ঘটনা ঘটেছিল। পাকিস্তানি হানাদারেরা বোমা বর্ষণ করে কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেয়। সেটি ৩০শে মার্চের দুপুরের ঘটনা। বেতার কেন্দ্রটির সেখানেই ইতি ঘটতে পারত। কর্মীরা কিন্তু দমেননি। কালুরঘাট কেন্দ্রের এক কিলোমিটারের একটা অতিরিক্ত ট্রান্সমিটার ছিল। সেটিকে খুলে একটি মাইক্রোবাসে চাপিয়ে তাঁরা রওনা হয়েছিলেন মুক্তাঞ্চলের খোঁজে; প্রচারের কাজ নতুন করে শুরু করবেন এই পরিকল্পনা নিয়ে। ঐ ট্রান্সমিটারটি অবশ্য ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়নি, আগরতলাতে গিয়ে তাঁরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি ট্রান্সমিটার পেয়েছিলেন। সেটি ব্যবহার করে এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে তাঁরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু করেন। এখান থেকে অনুষ্ঠান প্রচার চালু ছিল মে মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত। তারপরে শুরু হয় কলকাতা থেকে তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্বের সম্প্রচারের।

বেতারের ঐ দশজনের অবকাশ ছিল না বিশ্রামের। পেছনে ফেরার কোনো পথ ছিল না। ফেরার কথা তাঁরা ভাবেনওনি। জামাকাপড় ঠিক ছিল না। গায়ে যা ছিল তা পরেই থেকেছেন। দিনের পর দিন। এপ্রিলের ১১ তারিখে আগরতলায় প্রথম নতুন জামাকাপড় কেনেন। খাবারদাবারের কষ্ট ছিল ভীষণ। আগরতলায় প্রথমে থাকতেন বাঁশের ঘরে। খবর লিখতেন ঘাসের ওপর বসে। স্বাস্থ্য এমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ লজ্জা পেয়েছে। বিপরীতে নেতারা ছিলেন রেস্ট হাউসে। তাঁদের জন্য কষ্ট ছিল না থাকা-খাওয়ার।

এরই মধ্যে খবর সংগ্রহ, খবর তৈরি, কথিকা লেখা– সব কিছু করতে হয়েছে। উদ্ভাবন শক্তির চমৎকার ব্যবহার ঘটিয়ে মুস্তাফা আনোয়ার একটি স্লোগান দাঁড় করিয়েছিলেন, 'ওরা মানুষ হত্যা করেছে–আসুন আমরা পশু হত্যা করি।' অত্যন্ত উপযোগী একটি

স্লোগান। সে জন্য জনপ্রিয় হয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের ভয়াবহ একটি মুখাবয়ব এঁকে শিল্পী কামরুল হাসান তার নিচে ঐ স্লোগানটি বসিয়ে দিয়েছিলেন। এ ধরনের উদ্ভাবনা কলকাতা থাকা অবস্থায় অবশ্য আর সম্ভব হয়নি। তার কারণ আমলাতান্ত্রিক নিরুৎসাহিতকরণ। কলকাতায় রেকর্ড করা হয়েছিল গুরুসদয় দত্তের একটি ব্রতচারী গান, 'মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ/ অনুকরণ খোলস ভেদি/ কায়মনে বাঙালি হ'। গানটা মোটেই জমেনি। তিন-চারবার প্রচারের পর সমালোচনার মুখে রেকর্ডটি বাতিল করা হয়েছিল। স্লোগান হিসেবে 'আসুন আমরা পশু হত্যা করি'র সঙ্গে 'আবার তোরা মানুষ হ'র তুলনা করলে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার সঙ্গে কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণের ব্যবধানটা বোঝা যায়। একাত্তরে বাঙালিকে মানুষ হতে উপদেশ দেওয়া পরিহাসের শামিল ছিল বৈকি।

হস্তক্ষেপ অবশ্য অন্য মহল থেকে ঘটেছে। বেতার কেন্দ্রটি চালু করবার সময়ে কী নাম দেওয়া যায় সে প্রশ্ন উঠেছিল। স্বভাবতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেলাল মোহাম্মদ কাগজে নাম লিখেছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সহযোদ্ধা আবুল কাসেম সন্দ্বীপের পরামর্শ ছিল সাথে 'বিপ্লবী' শব্দটি থাকুক। সেটাও ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা তাই 'বিপ্লবী' শব্দটি যোগ করে দিয়েছিলেন। তারপরেও প্রচারণায় কেউ দ্বিধা করতে পারে এমন বিবেচনায় আবুল কাসেম সন্দ্বীপ নিজেই মাইক্রোফোনে ঘোষণা করেছিলেন, 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি।' কিন্তু বেতারের ঐ বিপ্লবী চরিত্রটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, এমনকি নামেও নয়। ৩০ তারিখে পাকিস্তানিরা হানা দিয়েছিল, তার আগেই, ২৮ তারিখেই, বিদ্রোহী বাঙালি সেনা অফিসারদের পরামর্শেই বিপ্লবী নামটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। সেনা অফিসারদের আপত্তিটা মোটেই অন্যায় বলা যাবে না; তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন ঠিকই, তবে তাঁদের লক্ষ্য তো বাংলাদেশকে স্বাধীন করা পর্যন্তই; সেখানে বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতাটা কোথায়? সেই সময়ে নাম থেকে বিপ্লব কে নামানোর পরামর্শটা সামরিক বাহিনীর দিক থেকে যদি নাও আসত, তবে অল্প পরে হলেও রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে যে আসত সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

এ প্রসঙ্গে আজ থেকে একশো বছর আগে কাজী নজরুল ইসলামের স্বপ্নের কথাটা স্মরণে আসে। নজরুল শুরু করেছিলেন বিদ্রোহী হিসেবেই। শুরুতে তিনিও সামরিক বাহিনীতেই ছিলেন; কিন্তু অচিরেই বিদ্রোহী নজরুলের স্বপ্ন দাঁড়িয়েছিল সমাজ বিপ্লবের। তাঁর ওপর প্রভাব আছড়ে পড়েছিল রুশ বিপ্লবের। কিন্তু বিপ্লবী অবস্থানে তিনিও শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেননি; শোকে-রোগে-দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে, এবং দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রসরমানতা না দেখতে পেয়ে তিনি অকালে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। সুস্থ থাকলে স্বাধীনতার নামে দেশভাগ যে তাঁকে অসুস্থ করে ফেলতো এটা অনুমান করা যায়। বিপ্লবী হওয়া এবং হলে টিকে থাকা কোনো সহজ কাজ ছিল না।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা ও আত্মসত্তা

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া

'স্বাধীনতা' শব্দটি অর্থের বিবেচনায় ব্যাপক ও বিচিত্র। তাই পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা সমস্যাজনক। বাংলাদেশে স্বাধীনতা নিয়ে সচরাচর যা আলোচিত হয় তা মূলত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জন এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনকেন্দ্রিক। স্বাধীনতা নিয়ে এটি অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। সে আলোচনায় পরে আসছি। এর বাইরে বিচিত্র ক্ষেত্রে স্বাধীনতা শব্দটির যোগ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা শব্দের জন্ম স্ব-অধীনতা থেকে এবং 'স্ব-অধীনতা'র ভেতরেই স্বাধীনতা বোঝার সমস্ত রসদ রয়েছে।

একজন ব্যক্তি অথবা একাধিক ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠী যখন নৈসর্গিকভাবেই নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য জানান দিতে শুরু করে তখন থেকেই আসলে তার বা তাদের স্বাধীনতার পথে যাত্রা শুরু হয়। নিতান্তই অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তখন স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিজস্বতা-স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা ইত্যাদি শব্দগুলোকে একশব্দে অর্থবোধক করা যেতে পারে 'আত্মসত্তা' শব্দটির মাধ্যমে। আত্মসত্তার বিকাশ সূচিত হওয়া মানেই স্বাধীনতার সূচনা। স্বতন্ত্র আইডেন্টিটি হিসেবে নিজের জানান দেওয়া।

'আত্ম' শব্দটিকে প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির মতো যৌথেরও আত্মসত্তা থাকে। প্রয়োজন, গভীর সম্পর্ক ও নিবিড় সমঝোতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বীকার করেই যৌথের আত্মসত্তা গড়ে ওঠে। পরিবার ও সমাজে তার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লক্ষ করা যায়। জনগোষ্ঠী আরও বৃহৎ পরিসর। নিজস্ব রাষ্ট্র না থাকলেও যৌথের আত্মসত্তার কারণেই একটি জনগোষ্ঠী একই ভাষায় কথা বলে, একই সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা লালন করে। সাধারণত ভূগোল ও নৃতত্ত্ব সেখানে গভীর প্রভাবক হিসেবে সক্রিয় থাকে। নিঃসন্দেহে এই 'যৌথ' একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীও বটে। যারা যোগসূত্র রেখে কাল পরম্পরায় একটি জীবন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং উক্ত ব্যবস্থাকে লালন করেছে, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে বিকশিত করেছে। কিন্তু সেই বিকাশকে কুসুমাস্তীর্ণ ভাবার কারণ নেই, বিচিত্র প্রভাব-দমন-অভিঘাতের পরেও যখন একটি জনগোষ্ঠী নিজস্বতার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করে, তখন প্রতীয়মান হয় আত্মসত্তার স্বাধীনতা তাদের অস্তিত্বের সমান্তরাল।

স্বভাবতই বাংলাদেশ জনপদের মানুষেরও আত্মসত্তার জন্ম তার স্বকীয় জীবন ব্যবস্থার জন্মলগ্ন থেকে। বাংলার আবহমান কালের মানুষ এই জীবন ব্যবস্থার নির্মাতা। পাশাপাশি ভূমি-নদী-নিসর্গ-পাহাড়-সমুদ্র ও অরণ্য এই জীবন ব্যবস্থার নির্মাণকে প্রভাবিত করেছে। আর সেদিন থেকেই তাদের জীবনে স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে মূল সমস্যাই হলো উপনিবেশ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ শাসন করেছে অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী, যাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য

ছিল সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদ। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, ইসলামি সংস্কৃতি এবং সবশেষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বাঙালি সমাজকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক আধিপত্যের কারণেই।

উপনিবেশের বিরুদ্ধে এই জনপদের মানুষের প্রত্যক্ষ এবং সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ইতিহাস সুদীর্ঘ। এই লড়াইগুলো বার বার প্রমাণ করেছে মানুষ তার স্বাধীন অস্তিত্বকে বিপন্ন হতে দিতে রাজি নয়। ১৭৬০ সালের ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান অবধি প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের দীর্ঘ তালিকা এই জনপদের ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অংশ। যেখানে বাঙালির পাশাপাশি বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এসবের ভেতরেই সুপ্ত ছিল স্বাধীনতার বাসনা। আবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করেছেন তারা বাঙালি...বৈদিক যাগযজ্ঞ সর্বতোভাবে গ্রহণ করেনি। বৌদ্ধ ধর্ম মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও বাঙালি বৌদ্ধ মহাযান মতকে 'বজ্রযান' 'সহজযান' ও তন্ত্রসাধনার পথে বিবর্তিত করতে পেরেছে। নাথ যোগীদের কায়া-সাধনা এবং হিন্দু শক্তি সাধনার সঙ্গে বৌদ্ধ ভাবনা যুক্ত করে হিন্দু-বৌদ্ধ ভেদ লুপ্ত করে দিয়েছে; বাঙালিয়ানার জয়গান গেয়েছে। তাই বাংলার আউল-বাউল-সুফি সম্প্রদায় দেহ ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের খোঁজ করে। বাংলার বৈষ্ণব সর্বজীবে প্রেম বিতরণ করে। বাঙালির চোখে ঈশ্বরের নরলীলাই সর্বোত্তম।

বাঙালি নৃগোষ্ঠী ব্যতিরেকে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও একই সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। এত অভিঘাত সত্ত্বেও তারা নৃগোষ্ঠীর আত্মসত্তার প্রশ্নে লড়াই চালিয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। আধুনিক বিশ্ব-বাস্তবতায় সেই স্বাধীনতার বাসনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার অবকাশ সৃষ্টি করে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। যার মাধ্যমে আমাদের যৌথ আত্মসত্তা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ করে এবং নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের অবকাশ পায়। ফলে ১৯৭১ এই জনপদের মানুষের স্বাধীন হবার সকল অবকাশ সৃষ্টি করে। আত্মবিকাশের কর্তৃত্ব অর্পিত হয় নিজের হাতে। এ অর্জন কেবল বাঙালি নৃগোষ্ঠীর নয়, এই জনপদে বসবাসরত সকল নৃগোষ্ঠীর।

কিন্তু স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জন এবং নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করাই কেবল স্বাধীনতা নয়। রাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীয় পরিচালক প্রতিষ্ঠান মাত্র। তার ভেতরে সক্রিয় থাকে নানা গোষ্ঠী, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি। ফলে উত্তর-উপনিবেশ কালের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায়, বিশ্বায়নের বাস্তবতায়, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের লগ্নে স্বাধীনতার সীমা আরও বিস্তৃত। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকা একেবারে মৌলিক প্রশ্ন। সে নিয়ে বিস্তারিত আলাপের প্রয়োজন নেই। বার বার আলাপ প্রয়োজন এই যৌথ আত্মসত্তা নির্মিত হওয়ার কারণ, বিবিধ সম্পর্কের মূলসূত্র ও চিহ্নগুলো নিয়ে। আত্মসত্তা বিকাশের দশা তার পরের আলাপ। নানা মত-পথ ও বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। কিন্তু ভূখণ্ডের মতো, ভাষার মতো আত্মসত্তা মূল ভিত্তি। ইতিহাস সেই ভিত্তিকে নির্মাণ করেছে, প্রমাণ করেছে। সুতরাং আত্মসত্তা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবকাশ নেই। নানা মত-পথ ও বৈচিত্র্য জরুরি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে। সেখানে শেষাবধি আত্মসত্তার স্বরূপ এবং বিকাশই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে যাবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অলৌকিকভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। এর পেছনে গণমানুষের যে আত্ম নিবেদন ছিল, যে বাসনা ছিল এবং আছে তার শেকড়ে পৌঁছাতে হবে। মৌলিক চাহিদা পূরণ সেখানে প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। স্বাধীন ভূখণ্ড অর্জিত হবার পর, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নৃগোষ্ঠীনির্বিশেষে আত্মসত্তার স্বরূপ আবিষ্কার এবং ক্রমাগত তার বিকাশের অনুকূল পথ নিশ্চিত করাটাই কাজ। সেই স্বরূপ ও বিকাশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঠিক করে নেবে বিশ্বকে সে কীভাবে ধারণ করবে, কী গ্রহণ করবে এবং কী বর্জন করবে। এই প্রশ্নে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রকে একসূত্রে গাঁথতে পারাটাই কাজ। কেবল তখনই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সমাজ ও পরিবার হয়ে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাবে। আর প্রতিটি ব্যক্তি যেদিন স্বাধীনতা উপলব্ধি করবে সেদিনই রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সফল হবে। ১৯৭১—পরবর্তীকালে সেই কাজটা কতটা সম্ভব হয়েছে সেখানে ফিরে তাকাতে হবে বার বার। সেটাই স্বাধীনতার দাবি, সেটাই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথ।

সূত্র

১. *বাংলাদেশের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১

২. *বাংলা সাহিত্যে নন্দনভাবনা প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, লুৎফর রহমান, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৯, পৃ. ৫৩

ড. মো. হাবিব জাকারিয়া: অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, habibzakariaullash@gmail.com

নিবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ইপিআর বাহিনীর অবদান

ড. মো. নাজমুল হক

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার পিলখানায়। ইপিআর বাহিনী সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করেও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঢাকার বাইরের সেক্টর হেড কোয়ার্টার এবং সীমান্তবর্তী বিওপিসমূহে তাদের অবস্থান ছিল গৌরবজনক। সেখানে ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা অসীম সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়েছে। কেবল তা-ই নয়, তারা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় শহর ও বিস্তৃত সীমান্তভূমি যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনা-দখলমুক্ত করে টিকিয়ে রেখেছিল প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সব ইপিআর সূর্য-সন্তানদের বীরত্বগাথা স্মরণ করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরু থেকেই মূলত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই এর অনিবার্য পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে নতুন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে আলবেদা জানিয়ে দেয় এদেশের মুক্তিকামী মানুষ। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে নির্ধারিত হয়ে যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাগ্য। সীমান্তবর্তী বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ২টি মহকুমা ও ২২টি থানার সব ক'টিতেই স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-জনতা-পেশাজীবী ও সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছিলেন।

সে সময় সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য দিনাজপুরে গঠিত হয়েছিল ৮ নম্বর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, ঠাকুরগাঁও-এ ছিল ৯ নম্বর সাব-সেক্টর এবং ঠাকুরগাঁওয়ের অধীন ছিল পঞ্চগড় সাব-সেক্টর। দিনাজপুরে ইপিআর সেক্টর হেড কোয়ার্টার ছিল কাঞ্চন নদীর তীরে পুরাতন কুঠিবাড়ি ভবনে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন পাঞ্জাবি কর্নেল তারেক রসুল কোরেশী। তার অধীনে অন্যান্য অফিসার ছিলেন মেজর জিলানি, মেজর রাজা, মেজর তারিক আমিন, মেজর দুররানি, মেজর নাসের ও আরও কয়েকজন অবাঙালি অফিসার। বাঙালি অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মেজর ডা. মাকসুদ হোসেন, ক্যাপ্টেন নজরুল হক, ক্যাপ্টেন নাজির আহমদ, ক্যাপ্টেন ইদ্রিস। এছাড়া ছিলেন কোয়ার্টার মাস্টার আবু সায়িদ খোন্দকার, হাবিলদার ভুলু, প্লাটুন হাবিলদার নাজেম, সুবেদার মেজর আবদুর রউফ, সুবেদার আরব আলী, স্টোরম্যান একরামুল হক, হাবিলদার আবুল কালাম, নায়েক আবদুল হাকিম, নায়েক আবদুল আজিজ, হাবিলদার ইসহাক, হাবিলদার রেজাউর রহমান, হাবিলদার আবদুস সোবহান, সিপাহি মোস্তাফিজুর রহমান, সিপাহি কাঞ্চন আলী, ল্যান্স নায়েক মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। এদের মধ্যে কুঠিবাড়ি ক্যাম্পের কামান, ৩ ইঞ্চি মর্টার ও যুদ্ধকৌশলে দক্ষ ছিলেন হাবিলদার নাজেম, সুবেদার আরব আলী ও সুবেদার মেজর আবদুর রউফ এই তিন বাঙালি সৈনিক।

সেক্টর হেড কোয়ার্টারে বাঙালি সৈনিকদের ওপর অবাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের ছিল পদে পদে বৈষম্য, বঞ্চনা, ঘৃণা, অপমান ও সন্দেহ। ২০শে মার্চ ঢাকা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর ফার্স্ট ফিল্ড কোম্পানির ১৫০ জন সৈনিককে ভারী অস্ত্রসহ দিনাজপুরে এনে নিয়ম মাফিক কুঠিবাড়িতে রাখার পরিবর্তে রাখা হয় সার্কিট হাউস চত্বরে তাঁবুতে। এতে বাঙালি সৈনিকদের মাঝে তৈরি হয় সন্দেহ। এছাড়া ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের কুচকাওয়াজে রীতি অনুযায়ী পুলিশ ও ইপিআরদের বাদ দিয়ে তারাই অংশগ্রহণ করে। এতে বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে বৃদ্ধি পায় শঙ্কা। সর্বোপরি পাকিস্তান দিবসের ভোজসভা ও বিনোদন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানি সৈনিকদের সামরিক কিন্তু বাঙালি সৈনিকদের সিভিল ড্রেস ও নিরস্ত্র অবস্থায় আলাদাভাবে বসার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা ছিল বাঙালি সৈনিকদের বন্দি করার কৌশল কিন্তু বাঙালি সৈনিকেরা অমান্য করে এ নির্দেশ। সুচতুর কমান্ডারের এই কৌশল ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি পরদিন পার্শ্ববর্তী আম বাগানে আম-দরবার ডেকে সেখানেও বাঙালি সৈনিকদের আবারও উইদাউট আর্মস হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। দরবারের সভায় কর্নেল কোরেশী বাঙালিদের 'হারামখোর', 'গাদ্দার জাতি' এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে ভাষণ দেন। দরবার শেষে ঐ দিনই বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন নাজির আহমদকে অর্ধেক বাঙালি জওয়ান নিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে এবং অন্যান্যদের দশজনের দলে ভাগ করে বিভিন্ন সীমান্ত বিওপিতে মুভ করার জরুরি নির্দেশ জারি করেন কর্নেল কোরেশী। এভাবে বাঙালি সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরও জটিল।

২৫শে মার্চ ঢাকা ম্যাসাকারের পরদিন সকাল ১১টায় কারফিউ জারি করা হয় দিনাজপুরে। সেক্টর হেড কোয়ার্টার ও শহরের পরিস্থিতি হয়ে ওঠে থমথমে। ইতোমধ্যে দিনাজপুরে খবর আসে সৈয়দপুরে বাঙালি জনতার ওপর নির্যাতন ও হত্যার। এ সময় কয়েকজন ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী আন্দোলনকারীকে অবাঙালি সৈনিকেরা কুঠিবাড়িতে এনে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ বীভৎসভাবে ফেলে রাখে। দিনাজপুরে সিগন্যাল কোরের একটি শক্তিশালী সেট স্থাপন করে অবাঙালি সৈনিক ও অফিসাররা ঢাকার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ চালু রেখেছিল। তাদের স্বতন্ত্র তৎপরতা বাঙালি সৈনিকদের মাঝে সৃষ্টি করে ক্ষোভ।

২৭শে মার্চ বিকাল ৪টার দিকে সিগন্যাল স্থাপনকারী একটি জিপকে দ্রুত গতিতে ব্যারাকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এটাকে

অবাঙালি সৈনিকদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ভেবে বাঙালি সৈনিকেরা তাৎক্ষণিকভাবে শুরু করে বিদ্রোহ। অবাঙালি সৈনিকেরা কোনো কিছু বোঝার আগেই তারা প্রথমে অব্যর্থ গুলিতে অস্ত্রাগার পাহারারত অবাঙালি তিন সৈনিককে হত্যা করে অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এরপর প্রচণ্ড গোলাগুলিতে আশপাশের অবাঙালি সেনারাও নিহত হয়। এই ঝটিকা আক্রমণে বিকালের মধ্যে কুঠিবাড়ির সকল অবাঙালি সেনা নিহত হলে ইপিআরদের সম্পূর্ণ দখলে আসে কুঠিবাড়ি। সেক্টর কমান্ডার কর্নেল কোরেশীসহ অন্যান্য অফিসাররা এ সময় ব্যারাকের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। তারা সম্ভবত সৈয়দপুর সেনানিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

কুঠিবাড়ি পতনের পর একাকার হয়ে যায় ইপিআর ও জনতা। এরপর পাকিস্তানি বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ ও অগ্রগমন ঠেকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে ইপিআরদের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতা-অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ সমন্বয়ে প্রায় ১ ব্যাটালিয়ন শক্তি সঞ্চয় করে দশ মাইল, রাণিনগর, মোহনপুর স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ অবরোধের পর ১৩ই এপ্রিল পাকিস্তান বাহিনী সৈয়দপুর সেনানিবাস থেকে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাংক, মর্টার ও সাঁজোয়া যান নিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিক দিয়ে দিনাজপুরের উপকণ্ঠে এসে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহরের ওপর। পাকিস্তান সেনাবাহনী পুনর্দখল করে দিনাজপুর শহর। সম্মুখ ফ্রন্ট থেকে পিছিয়ে আসা ইপিআরগণ ঠাকুরগাঁও থেকে আসা ইপিআরদের ভাতগাঁ ব্রিজ, নীলফামারী ও দেবীগঞ্জ এলাকায় অবরোধকারী দলের সঙ্গে যোগ দেন।

ঠাকুরগাঁও শহর ও ইপিআর সাব-সেক্টরের অবস্থাও ছিল দিনাজপুর শহরের অনুরূপ আন্দোলন, সংগ্রাম, মিছিল ও সমাবেশে উত্তাল। জনতার তীব্র ক্ষোভ, আন্দোলন ও মিছিল সমাবেশ ছড়িয়ে পড়ে পঞ্চগড় শহর এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমার সকল থানা পর্যন্ত। তবে বাঙালি সৈনিকদের ওপর অবাঙালি সৈনিকদের বৈরী আচরণ ও প্রতিহিংসামূলক অবস্থানের বিষয় তখনও সীমান্তবর্তী বিওপিসমূহে ততটা প্রকট হয়ে ওঠেনি। বিশেষত ২৫শে মার্চের 'অপারেশন সার্চলাইটে'র ঢাকা ম্যাসাকারের সংবাদ সম্পর্কে সীমান্ত চৌকিতে অবস্থানরত বাঙালি ইপিআর সৈনিকদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু ঠাকুরগাঁও সাব-সেক্টরের বাঙালি সৈনিকেরা দিনাজপুর, সৈয়দপুর ও ঢাকার ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত ও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

দিনাজপুর সেক্টরের অধীন ঠাকুরগাঁও ৯ উইংয়ের কমান্ডার ছিলেন পাঞ্জাবি মেজর মোহাম্মদ হোসেন এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন অবাঙালি ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে পদমর্যাদায় সিনিয়র ছিলেন সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন। এই উইংয়ে বাঙালি সৈনিকের সংখ্যা ছিল বেশি। ২৫শে মার্চ কমান্ডার মেজর মোহাম্মদ হোসেন সীমান্ত চৌকি পরিদর্শনের উদ্দেশে শহরের বাইরে ছিলেন। তাই দিনাজপুরের কুঠিবাড়িতে জরুরি বৈঠকে যোগদান করেন ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। ২৬শে মার্চ সকালে সব জেসিওদের ডেকে মিটিং করেন মেজর ও ক্যাপ্টেন। তারা মিটিংয়ে পাকিস্তান সরকারের সর্বশেষ ফরমান পড়ে শোনান এবং নানাভাবে বাঙালি জাতি ও সৈনিকদের গালমন্দ করেন। সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও জেসিওরা সেখানে প্রতিবাদ না করে চলে যান যার যার ব্লকে। তখনও তারা আগের রাতের 'অপারেশন সার্চলাইট', ঢাকা বা দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না।

২৬শে মার্চ বিকালে ঠাকুরগাঁও শহরে কারফিউ জারি করা হয়। উইং কমান্ডারের নির্দেশে শুরু হয় শহরে ইপিআর টহল।

উত্তেজিত জনতার কারফিউ ভঙ্গ, সমাবেশ, মিছিল ও ব্যারিকেডে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শহরের পরিস্থিতি। ২৭শে মার্চ দুপুরে একটি বিশাল মিছিল শহরের চৌরাস্তা থেকে কালিবাড়ির দিকে যাওয়ার পথে কেরামত মোক্তার সাহেবের বাসার সামনের রাস্তায় পৌঁছালে ইপিআরের একটি জিপ ও লরি তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। জিপ থেকে অস্ত্র হাতে নেমে আসে মেজর মোহাম্মদ হোসেন এবং ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং মোহাম্মদ আলী নামে একজন রিকশাওয়ালা এগিয়ে এসে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজর পর পর তিনটি গুলি ছুঁড়লে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহিদ মোহাম্মদ আলী। মেজররা ফিরে যায় ব্যারাকে। পরদিন তাদের টহলের সময় নিজের বাড়ির জানালার ভেতরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় শিশু নরেশ চৌহান। এরপর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ঠাকুরগাঁও শহর।

২৮শে মার্চ মেজর মোহাম্মদ হোসেন এবং ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম অবাঙালি জোয়ানদের ডেকে গোপনে আলাদাভাবে মিটিং করে ঐ দিন রাত এগারোটায় বাঙালি সৈনিকদের হত্যা করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ খবর জেনে যান সুবেদার হাফিজ। এর প্রতিক্রিয়ায় অতি দ্রুত সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে গোপন বৈঠক করে তাদের আগেই পাঞ্জাবিদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত ১০:১৮ মিনিটে সুবেদার হাফিজ প্রথম স্টেনগান দিয়ে ফায়ার ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব বাঙালি সৈনিক গুলি করা শুরু করেন। এরপর সারা রাতজুড়ে ইপিআর ব্যারাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয় অবাঙালি সৈনিকদের। গোলাগুলির শব্দে প্রথমে শহরে প্রচণ্ড ভীতি ছড়িয়ে পড়লেও যখন 'জয় বাংলা' স্লোগান ও বাঙালিদের এগিয়ে আসার আহ্বান শোনা যায়, তখন শহর থেকে রাতের অন্ধকার ভেদ করে শত শত মানুষ ছুটে যায় ইপিআর ক্যাম্পের দিকে। সকালের মধ্যে সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে ঝটিকা যুদ্ধের পর ৮ নম্বর সাব-সেক্টর উইং দখল করে নেন ইপিআর বাহিনীর বাঙালি সৈনিকেরা। ক্যাপ্টেন নাবিদ আলম পরদিন সকালে দিনাজপুরের দিকে পলাতক অবস্থায় স্ত্রীসহ নিহত হন। মেজর মোহাম্মদ হোসেনকে স্ত্রীসহ হত্যা করা হয় তার নিজস্ব বাংলোয়। এই সংঘর্ষের সময় একজন মেজর ও ক্যাপ্টেনসহ ১১৫ জন ইপিআরের সকল পাকিস্তানি সৈন্যই নিহত হয়।

২৮শে মার্চ রাতের সফল যুদ্ধের পর সংগ্রাম ও নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন। তিনি ২৯ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরবর্তী কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তার প্রথম কাজ হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতিআক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ছুটিরত, অবসরপ্রাপ্ত ও পলায়নকারী সকল বাহিনীর সদস্য, আনসার ও মুজাহিদ এবং ইতোমধ্যে রাইফেল ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র ও জনতাকে একত্রিত করে একটি নিয়মিত বাহিনীর অনুরূপ ব্যাটালিয়ন গঠন করে দশ মাইলে নিয়োজিত দিনাজপুরের ইপিআর ফ্রন্টের বিপরীতে একই মহাসড়কের ভাতগাঁ ব্রিজের নিকট নতুন ফ্রন্ট খুললেন। তার লক্ষ্য ছিল দশ মাইল অতিক্রম করে পাকা সড়ক ধরে পাকিস্তানি বাহিনীর উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি সৈয়দপুরকে মোকাবিলা করে পুরো ঠাকুরগাঁও মহকুমাকে শত্রুমুক্ত রাখা। এজন্য তিনি সৈয়দপুরের কাছাকাছি চম্পাতলি পর্যন্ত তার বাহিনী মোতায়েন করেন। মূল এই দলগুলোকে সহায়তার জন্য তিনি ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের বিপরীত দিকে প্রায় দশ মাইল দূরত্বে ছোটো ছোটো কয়েকটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তেঁতুলিয়া 'বি' কোম্পানির অধিনায়ক সুবেদার আবদুল খালেকের অধীনে ২ কোম্পানি ইপিআর ও ১ কোম্পানি মুজাহিদকে যতটা সম্ভব অস্ত্র সজ্জিত করে মোতায়েন করেন ভাতগাঁ ব্রিজে। চিলাহাটি 'ই' কোম্পানির অধিনায়ক সুবেদার বদিউজ্জামানের নেতৃত্বে মুজাহিদসহ একটি কোম্পানিকে দেবীগঞ্জে স্থাপন করেন। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, যুদ্ধ কৌশল ও সাংগঠনিক শক্তিতে আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র-জনতা, ইপিআর এবং ইস্ট রেজিমেন্টের ছুটিরত সৈন্যসহ প্রায় এক ব্যাটালিয়ন শক্তি সৈয়দপুর অভিমুখে প্রেরণ ও মোতায়েন করা সম্ভব হয়। এই শক্তি বীরগঞ্জ, ভাতগাঁ ব্রিজ, খানসামা, জয়গঞ্জ, ঝাড়বাড়ি ও দেবীগঞ্জে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। এছাড়া সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান, মানুষের জানমালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়াজনীয় যোগাযোগের উদ্দেশে ইপিআরের 'সি' কোম্পানির সুবেদার আবুল হাশেমের অধীনে পঞ্চগড়ে এবং সুবেদার হাজি মুরাদকে রুহিয়া সাব-সেক্টরের দায়িত্ব প্রদান করে পাঠানো হয় সেখানে। সুবেদার হাফিজ তাঁর কোম্পানিসহ দেবীগঞ্জ হয়ে খানসামা পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে খানসামার নিকট ঢেঁপা নদী পার হওয়ার চেষ্টা করার সময় সুবেদার হাফিজের কোম্পানি অতর্কিত হামলা করলে বহু সংখ্যক পাকসেনা হতাহত হয় এবং ১০ গাড়ি গোলাবারুদ ও রসদপত্র দখল করতে সক্ষম হয়।

দেবীগঞ্জের আশপাশের বিওপিসমূহে অবস্থানরত বাঙালি ইপিআররা সমবেত হয় দেবীগঞ্জের কোম্পানিতে। এখান থেকে তারা একসঙ্গে অবরোধ করে জয়গঞ্জ ও খানসামা। তবে এর কয়েকদিন পর পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারী অস্ত্রসহ এই কোম্পানির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করলে তারা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে পিছু হটে অবস্থান গ্রহণ করে যথাক্রমে দেবীগঞ্জ, নয়াদিঘি ও শালডাঙায়। অবশেষে, এ সব ডিফেন্সের সৈনিকসহ সকলেই উপস্থিত হয় পঞ্চগড় সাব-সেক্টর ক্যাম্পে।

যুদ্ধ পরিচালনা ও সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহের জন্য রুহিয়ার বিপরীতে ভারতীয় ৭৫ বিএসএফ কমান্ডার কর্নেল ব্যানার্জির সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। তবে গোলা ও অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। ২রা এপ্রিল অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম. টি হোসেন ঠাকুরগাঁওয়ে বেসরকারি প্রশাসন এবং সংগ্রাম পরিষদে যোগদান করলে সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন তার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করেন। ঠাকুরগাঁও পতনের একদিন পূর্বে বেসামরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশে তিনি ঠাকুরগাঁওয়ে অবস্থিত 'ন্যাশনাল ব্যাংকের' ভল্টে সংরক্ষিত ৩১ বাক্স (এক কোটির

বেশি) টাকা সুবেদার হাশিমের নেতৃত্বে নায়েক সুবেদার মতিউর রহমানসহ ২২ জন ইপিআরকে মেশিনগান ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত করে কড়া প্রহরায় পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী নিজে এসে তা গ্রহণ করেন। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনও টাকার বাক্সের সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিলেন।

১৫ই এপ্রিল সকাল এগারোটার দিকে সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ ও সাঁজোয়া সামরিক বহরে সুসজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর প্রথম শেলটি এসে বিস্ফোরিত হয় ঠাকুরগাঁও শহরের দক্ষিণ দিকে ইপিআর ক্যাম্পের কাছে। এরপর মুহুর্মুহু গোলা এসে পড়তে থাকে শহরের লোকালয়ে। পাকিস্তানি সৈনিকেরা হেঁটে ও জিপ-লরিতে রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে দিতে ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। কয়েকদিন আগে থেকেই শহরের লোকজন আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামে। অবশিষ্ট যারা ছিল, তারাও রুদ্ধশ্বাসে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়া শুরু করে উত্তর দিকে। এর আগেই ভাতগাঁ ব্রিজে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সৈনিকেরা পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তিশালী আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে পজিশন ত্যাগ করে দেবীগঞ্জ, জয়গঞ্জ, ঝাড়বাড়ি থেকে পিছিয়ে চলে আসে পঞ্চগড়ে।

দিনাজপুর এবং ঠাকুরগাঁওয়ের মতো পঞ্চগড়ের ইপিআর বিদ্রোহ সুপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। এখানকার সকল কার্যক্রম এবং বিওপিসমূহের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রিত হতো ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর থেকে। ২৫শে মার্চের ঢাকা ম্যাসাকার, স্বাধীনতা ঘোষণা এমনকি, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরে ইপিআর বিদ্রোহের খবর পঞ্চগড়ে পৌঁছায় অন্তত একদিন বিলম্বে। সে কারণে লক্ষণীয় যে, সেখানে বাঙালি ইপিআররা অবাঙালি ইপিআরদের পরাস্ত করে বিচ্ছিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে। তদুপরি, এই অঞ্চলের বিওপিসমূহে অবাঙালি সৈনিকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ২৯শে মার্চ বাঙালি ইপিআর, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও জনতা সম্মিলিতভাবে তেঁতুলিয়া থানার বিভিন্ন বিওপির অবাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র ও খতম করে। তেঁতুলিয়ায় নিহত হয় অবাঙালি সুবেদার মির্জা খান। পঞ্চগড় শহরের ক্যাম্পে নিহত হয় একজন। আটোয়ারী অঞ্চলের ইপিআর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল রুহিয়া রামনাথ হাটের পরিত্যক্ত মারোয়ারি রাইস মিলটিতে। এই ক্যাম্পে অবস্থান করত নায়েব সুবেদার বাদশা গুল ও নায়েব সুবেদার কালা খান নামে দুজন পাকিস্তানি ইপিআর। বোধগাঁও বিওপিতে ছিল অবাঙালি সুবেদার গোফরান। বর্ষালু পাড়া সাব-কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে ছিল মেহের খানসহ একাধিক অবাঙালি ইপিআর। এরা সবাই পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে রামনাথ কোম্পানি হেড কোয়ার্টারে। স্বল্প সংখ্যক জনতা সেখানে গিয়ে ক্যাম্প দখল করার চেষ্টা করে কিন্তু অবাঙালি ইপিআরদের আক্রমণে তারা ফিরে আসে আহত হয়ে। এরপর বাঙালি ইপিআরসহ কয়েক শত বিক্ষুব্ধ জনতা পুনরায় ক্যাম্প আক্রমণ করে হত্যা করে সেখানে আশ্রয়গ্রহণকারী অবাঙালি সৈনিকদের।

১৯শে এপ্রিল দুপুরের মধ্যে পঞ্চগড় শহর পুনর্দখল করে পাকিস্তানি বাহিনী। সকাল ১০টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি বিরাট দল কামান ও মর্টারের গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে করতোয়া নদীর দক্ষিণ দিক থেকে ঢুকে পড়ে পঞ্চগড় শহরে। এ সময় শহরটি ছিল জনমানবহীন। মর্টারের গোলার প্রচণ্ড আঘাতে বাজারের ঘরবাড়িতে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। ডাকবাংলায় বসে সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন তার অন্যান্য কমান্ডারদের নিয়ে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও বিধ্বস্ত বাহিনীর পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে জরুরি মিটিং করছিলেন। এমন সময় একটি গোলা এসে বিস্ফোরিত হলো ডাকবাংলা ঘরের পাশে রাখা গোলাভর্তি

ট্রাকের ওপর। সেগুলো দখল করা হয়েছিল খানসামার যুদ্ধে। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন ও অন্যান্য কমান্ডাররা দ্রুত বেরিয়ে এসে ক্ষিপ্র গতিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর প্রচণ্ড ফায়ার পাওয়ারের সামনে টিকতে না পেরে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন ভজনপুর-তেঁতুলিয়ার দিকে। শেলের আঘাতে আহত হলেন সুবেদার হাশেমসহ বেশ কয়েকজন। পাকিস্তানি সৈনিকরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল শহরে।

এদিন সন্ধ্যার দিকেই সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন, সুবেদার হাফেজ, সুবেদার আহমদ হোসেন ও নায়েক সুবেদার খালেকসহ ইপিআরের একটি দল ভজনপুরে উপস্থিত হয়ে পরদিন সকালে স্থানীয় জনতার সহায়তায় করতোয়া নদীর উত্তর তীর ঘেঁষে একটি ডিফেন্স লাইন গড়ে তোলেন। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন অর্ধেক সৈনিক সেখানে রেখে অবশিষ্টদের নিয়ে উপস্থিত হন তেঁতুলিয়ায়। সেখানে তিনি আগেই চলে আসা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ইপিআর সদস্যদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। পাকিস্তানি বাহিনী ২০শে এপ্রিলের মধ্যে পঞ্চগড়ে তাদের দৃঢ় অবস্থান সম্পন্ন করে জগদলহাটে স্থাপন করে দ্বিতীয় অগ্রবর্তী ঘাঁটি। তারা আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে অমরখানা বিওপিতে খুব দ্রুত গড়ে তোলে শক্তিশালী ফ্রন্ট। ২১শে এপ্রিল সকালের দিকে পাকিস্তানি গোলন্দাজ বাহিনীসহ ২ শতাধিক সৈন্যের একটি বিরাট সেনাবহর হেঁটে চাওয়াই নদীর ব্রিজ অতিক্রম করে মাগুরমারী বিওপি পেরিয়ে টিটিহি পুকুর পাড়ে উপস্থিত হয়। সেখানে তারা অপেক্ষা করে ঘণ্টাখানিকের মতো। এরপর ফিরে যায় অমরখানা ঘাঁটিতে। এখানেই তারা সর্ব উত্তরের সর্বশেষ ফ্রন্ট হিসেবে অবস্থান করে শেষ দিন পর্যন্ত। আজকের অভিযান সম্ভবত ছিল যুদ্ধকৌশল হিসেবে ফিল্ড জরিপ।

সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন ২৬শে এপ্রিল হাবিলদার দেওয়ানের অধীনে ১০ জনের একটি ছোটো দলকে পাঠান অমরখানার কাছাকাছি মাগুরমারী ক্যাম্পের পেছনে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তান বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ। তারা অমরখানার বিপরীতে অবস্থিত বিরাজোত, লুইপাড়া, জাবরীদুয়ার প্রভৃতি গ্রামে রেকি ও কয়েকদিন অবস্থান করে ফিরে আসে। ৩০শে এপ্রিল তাদের সঙ্গে চাওয়াই নদীকে মাঝখানে রেখে পাকিস্তান বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সৈন্যের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তারা ব্যবহার করেছিল মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। হাবিলদার দেওয়ান, হাবিলদার বদিউজ্জামান ও সিপাহি মকবুলসহ ছোটো এই দলটি প্রথম দিকে অগ্রসরমান পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেও পেছন দিক থেকে তারা অকস্মাৎ পাকিস্তান বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হাবিলদার বদিউজ্জামান ও সিপাহী মকবুল হোসেনকে হারিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় ক্ষুদ্র ইপিআর দলটি। গুরুতর আহত হয় আরও দুজন।

এই ঘটনার পর মাগুরমারীতে ইপিআর সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় দেড় কোম্পানির মতো। গঠন করা হয় একটি নতুন 'সি' কোম্পানি। অমরখানার কাছাকাছি গোয়ালঝাড়-ডুবানচি এলাকায় ডিফেন্স তৈরি করে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় সুবেদার হাজি মুরাদকে। ২রা মে থেকে পরবর্তী দুই মাস 'সি' কোম্পানি ওই এলাকায় অবস্থান করে পাকিস্তান বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়। এই ফ্রন্টে হাবিলদার সকিমউদ্দিন বিভিন্ন অপারেশনে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শহিদি মর্যাদা অর্জন করেন।

এর কিছুদিন পর মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর একইসঙ্গে জনযুদ্ধ (গেরিলা পদ্ধতি) ও সম্মুখ যুদ্ধরীতি কেন্দ্রীয়ভাবে অনুসরণের নির্দেশনা অনুয়ায়ী সেক্টরভিত্তিক নিয়মিত যুদ্ধ কৌশল প্রবর্তিত হলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সাহসী ও দেশপ্রেমিক ইপিআর বাহিনীর সদস্যরাও নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও অঞ্চল ৬ ও ৭ নম্বর সেক্টর এবং পঞ্চগড় ৬ নম্বর সাব-সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৮ই মে জেনারেল ওসমানী তেঁতুলিয়ার পার্শ্ববর্তী ভারতের কদমতলায় আগমন করেন এবং ভারতীয় সেনাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধ, প্রশিক্ষণ ও রণকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেখানে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও থেকে পিছিয়ে আসা ক্যাপ্টেন নজরুল, ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ আলী ও সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় জেনারেল ওসমানী ক্যাপ্টেন নজরুলকে পঞ্চগড় অঞ্চলে একটি ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। সহ-অধিনায়ক নিযুক্ত করেন সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিনকে। সেক্টর প্রতিষ্ঠিত হলে এই ৬নং সাব-সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত হন স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন আহমদ। তাকে সহায়তা করেন ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার এবং লে. মাসুদুর রহমান ও লে. মো. আবদুল মতিন চৌধুরী। ১৯শে নভেম্বর সম্মিলিত বাহিনীর অমরখানা ফ্রন্টে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরুর মাধ্যমে যে অগ্রযাত্রার সূচনা, এবং যার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল চূড়ান্তভাবে শত্রুমুক্ত হয়, সেই বাহিনীর অন্যতম অংশীদার ছিলেন ইপিআর বাহিনীর বিভিন্ন কোম্পানির দুঃসাহসী সৈনিকেরা– সুবেদার খালেকের 'বি' কোম্পানি, সুবেদার মুরাদ আলীর 'সি' কোম্পানি, সুবেদার হাফিজের 'এ' কোম্পানি ও সুবেদার হাশেমের 'ডি' কোম্পানি।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন শত্রুনিধনে, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে, তেমনি তেঁতুলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ইপিআর বাহিনী এবং সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন ও আরও কয়েকজন জেসিও ইপিআর সদস্য অপরিসীম অবদান রেখেছেন।

তথ্যসূত্র

গতিধারা থেকে প্রকাশিত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ

ড. মো. নাজমুল হক : লেখক, গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, nazmul.brur.bn@gmail.com

বাংলাদেশে গণহত্যা: বিদেশিদের চোখে

খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা

'রক্তই যদি কোনো জাতির স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারের মূল্য বলে বিবেচিত হয়, তবে বাংলাদেশ অনেক বেশি দাম দিয়েছে।' বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এ কথা স্বীকার করেন লন্ডনের *নিউ টাইমস* পত্রিকা ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সংখ্যায়।

মাত্র নয় মাসের পরিসরে জেনারেল ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে তিরিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ হত্যা করে। বাঙালি জাতিকে চিরতরে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য ইয়াহিয়া এবং তার সেনাপতিরা বাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চেয়েছিল।

সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসী ও তার নেতৃবৃন্দ একটা দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপরে পুরোপুরি সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সারা বিশ্বের সকল সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

সেই ভয়াবহ ঘটনার দুজন চাক্ষুষদর্শীর বিবরণী সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। এরা দুজন হলেন লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং ও *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* সংবাদদাতা সিড্‌নি এইচ্ শ্যানবার্গ।

১৯৭১ সালের ২৬শে ও ২৭শে মার্চ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যখন রাজধানী ঢাকা থেকে সকল বিদেশি সাংবাদিককে বহিষ্কৃত করে সাইমন ড্রিং তখন রাজধানী ঢাকাতেই আত্মগোপন করেন।

সান্ধ্য আইন স্বল্প সময়ের জন্য প্রত্যাহার হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ৭২ ঘণ্টাব্যাপী রাজধানী ঢাকার বুকে যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তা দেখতে ও সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। সেই ৭২ ঘণ্টায় যা ঘটেছে তার সবকিছু তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব না হলেও তাঁর বিবরণী থেকে এই বর্বরতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কীভাবে তথাকথিত 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে এনেছে– তা দেখবার জন্য ১৯৭১ সালের জুন মাসে যে সকল বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকা প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল শ্যানবার্গ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্যানবার্গকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত করে, কারণ শ্যানবার্গ তাঁর প্রেরিত সংবাদমালার মাধ্যমে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দাবির অসারতা ও অন্তঃসারশূন্যতা উদ্‌ঘাটন করে দেন।

৩০শে মার্চ *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় "ঢাকা কীভাবে 'ঐক্যবদ্ধ' পাকিস্তানের জন্য খেসারত দিয়েছে"– শিরোনামে প্রকাশিত সাইমন ড্রিংয়ের রিপোর্টে বলা হয়:

... নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যান্যরা নিহত। মুজিবুরের সমর্থক দুটো সংবাদপত্র অফিস ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

পঁচিশে মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার রাস্তার চলমান ট্যাংকগুলোর প্রথম লক্ষ্য ছিল ছাত্ররা।

ঢাকার উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে, সাঁজোয়া, গোলন্দাজ এবং পদাতিক বাহিনীর আনুমানিক তিনটি ব্যাটালিয়ন ব্যবহার করা হয়। রাত দশটার কিছু আগে তারা তাদের সৈন্য ছাউনি ত্যাগ করা শুরু করে। এগারোটার মধ্যে গুলিবর্ষণ শুরু হলো এবং যারা উল্টানো গাড়ি, গাছের গুড়ি, আসবাব, কংক্রিটের নল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করার চেষ্টা করেছিল, তারা নিহত হলো।

ছাত্রদেরও সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তখনও সেখানে যাঁরা ছিলেন পরে জানিয়েছেন যে, তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের শুধু গ্রেপ্তার করা হবে মাত্র। আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এম-২৪ ট্যাংকের পিছু, পিছু, একদল সৈন্য মধ্যরাতের কিছু পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হয়। সৈন্যরা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি দখল করে নেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় শেল-নিক্ষেপের জন্যে ঐ জায়গাকে ফায়ার-বেস হিসেবে ব্যবহার করে।

আমাকে বলা হয়েছে যে, সরকারবিরোধী চরমপন্থী ছাত্রদলের কেন্দ্রস্থল ইকবাল হলে আচমকা হানা দিয়ে দুশো ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। দুদিন পর দেখা গেল, পোড়া ঘরগুলোতে পড়ে আছে কিছু দেহ, কিছু বাইরে ছড়িয়ে, কিছু, ভাসছিল কাছের এক পুকুরে, শিল্পী এক ছাত্রকে দেখা গেল ইজেলের কাছে পড়ে আছে লুটিয়ে।

মাত্র ৩০টি মৃতদেহ ইকবাল হলে দেখা যায়। কিন্তু হলের করিডোরে যত রক্ত দেখা গেল তা থেকে মনে হয় না যে, নিহতের সংখ্যা এত অল্প। সেনাবাহিনী বহুসংখ্যক মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে।

আরেকটি হলে, পাক সৈন্যরা তাড়াহুড়ো করে গণকবর খুঁড়ে মৃতদের কবর দিয়ে ট্যাংক দিয়ে সমান করে দেয়। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাস করতেন তাঁরাও এই আক্রমণের শিকার হন। রেললাইনের পাশে দুশো গজজুড়ে যে বস্তি এলাকা ছিল তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

নিকটবর্তী বাজার এলাকাও সৈন্যরা গুঁড়িয়ে দেয়। দুদিন পর যখন ঘর থেকে বের হয়ে এসব দেখা সম্ভব হলো তখন দেখা গেল, বাজারের কিছু দোকানের মালিক তখনও শুয়ে আছে, যেন ঘুমোচ্ছে, কাঁধের ওপর পর্যন্ত তাদের কম্বল টানা। একই এলাকায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজে সরাসরি বাজুকা আক্রমণ করা হয়।

একদল সৈন্য যখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালাচ্ছিল তখন অন্য আরেকটি দল শহরের অন্যপাশে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের কেন্দ্র রাজারবাগের দিকে রওয়ানা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ট্যাংক থেকে প্রথম গুলিবর্ষণ করা হয়: তারপর সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে তাদের আস্তানাগুলো সমান করে দেয়, সাথে সাথে আশেপাশের বিল্ডিংগুলোতে এলোপাথারি গুলি চালায়। অপরদিকে আশেপাশে বসবাসকারী লোকেরও জানে না সেখানে কতজন মারা গেছে, তবে সেখানে অবস্থানরত ১,১০০ জন পুলিশের ভিতর খুব বেশি কেউ পালাতে পারেনি।

শহরের চারদিকে আগুন জ্বলছিল এবং সৈন্যরা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন জায়গাটুকু দখল করে নিয়েছিল। কোনো কোনো অঞ্চলে তখনও প্রচণ্ড শেলিং হচ্ছিল, তবে যুদ্ধের গতি ক্রমশ নিথর হয়ে আসছিল। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের উল্টোদিকে *দি পিপল* পত্রিকার শূন্য অফিস এবং তৎসংলগ্ন প্রায় সমস্ত বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলো এবং নৈশ পাহারাদারও রেহাই পেল না।

ভোরের কিছু আগে গুলিবর্ষণ প্রায় থেমে গেল এবং সূর্য ওঠার সাথে সাথে এক ভীতিজনক নিঃশব্দতা শহরের উপর চেপে বসলো; ফিরে আসা দুতিনটে ট্যাংকের শব্দ, মাঝে মাঝে কনভয়ের শব্দ ও কাকের চিৎকার ছাড়া সম্পূর্ণ শহর মনে হচ্ছিল পরিত্যক্ত এবং মৃত।

দুপুরের দিকে, আবার কোনোরকম সাবধান বাণী না জানিয়ে শহরের পুরনো অঞ্চলে সৈন্যরা ঢুকতে লাগল যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গলি-ঘুজির মধ্যে একলক্ষ লোক বাস করে।

পরবর্তী এগারো ঘণ্টা 'পুরনো শহর' নামে পরিচিত এ অঞ্চলের বিরাট অংশটুকু তারা ধ্বংস করল। ইংলিশ রোড, ফ্রেঞ্চ রোড, নাজিরা বাজার, নয়াবাজারকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো।

‘হঠাৎ তাদের রাস্তার প্রান্তে দেখা গেল,’ জানালো নাজিরা বাজার এলাকার এক বৃদ্ধ, ‘তারপর তারা এগিয়ে এলো প্রত্যেক বাড়িতে গুলি করতে করতে।’

গ্যাসোলিনের টিন হাতে সৈন্যরা অগ্রবর্তী ইউনিটকে অনুসরণ করত। যারা পালাবার চেষ্টা করত তাদের গুলি করা হতো। যারা থাকত তারা পুড়ে মারা যেত। সেদিন দুপুর থেকে রাত দুটোর মধ্যে প্রায় সাতশো পুরুষ, মহিলা এবং শিশু মৃত্যুবরণ করেছে বলে আমাকে জানানো হয়েছে।

আধা বর্গমাইল বা তার চেয়েও বেশি কমপক্ষে তিনটি এলাকায় একই রকম ‘প্যাটার্ন’ অনুসরণ করা হয়েছে। পুরনো শহরের পুলিশ থানাগুলোকেও আক্রমণ করা হয়েছে।

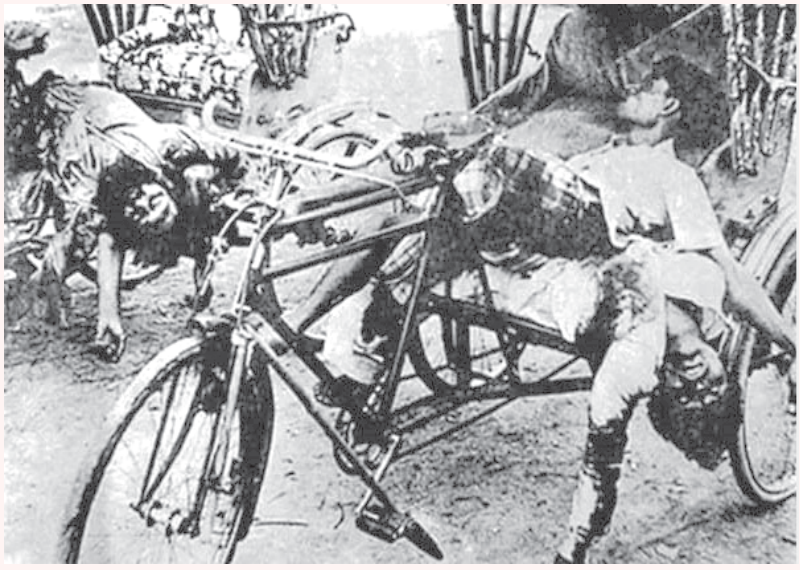

‘আমি আমার কনস্টেবলদের খুঁজছি।’ শনিবার সকালে একটি বাজার এলাকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বললেন জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর, ‘আমার এলাকায় ছিল ২৪০ জন এবং এ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি ৩০ জনকে– এবং সবাই মৃত।’

পুরনো শহরের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে সৈন্যরা লোকদের জোর করে ঘর থেকে টেনে এনে হত্যা করেছে। এবং এ এলাকাকেও সবশেষে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরনো শহরে, ২৬শে মার্চ, শুক্রবার, রাত এগারোটা পর্যন্ত সৈন্যরা ছিল এবং স্থানীয় বাঙালি ‘ইনফরমারদের’ নিয়ে ঘুরছিল। সৈনিকেরা অগ্নি-গোলক জ্বালিয়ে দিত আর চরেরা দেখিয়ে দিত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ঘরবাড়িগুলো। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তখন ঐ বাড়িটিকে হয় সরাসরি ট্যাংক বা রিকয়েলেস রাইফেল থেকে গুলি করে বা এক টিন গ্যাসোলিন দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হতো।

ইতোমধ্যে, শহরতলি থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা, শেখের সমর্থনের কেন্দ্র থেকে দশমাইল দূরে শিল্প এলাকার দিকে চলে যাচ্ছিল।

এসব এলাকায় রবিবার ভোর পর্যন্ত গুলিবর্ষণ চলল কিন্তু শুক্রবার রাতে অর্থাৎ শুরু হওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর শহরে অভিযানের আসল পর্যায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

বাংলা সংবাদপত্র *ইত্তেফাক* ছিল অভিযানের একটি শেষ লক্ষ্য। অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রায় চারশো লোক ঐ অফিসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা গেছে। শুক্রবার, বিকেল চারটায় বাইরের রাস্তায় চারটি ট্যাংক দেখা গেল। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, সাড়ে চারটার দিকে অফিসটি নরক হয়ে গেল। শনিবার সকালবেলা কতকগুলো ভস্মীভূত লাশ পেছনের কামরাগুলোতে পড়ে থাকল।

যেভাবে দ্রুত সৈন্যরা নেমে এসেছিল রাস্তায় ঠিক তেমনিই তারা আবার ফিরে গেল। শনিবার সকালে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো, সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হবে। এরপর রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সামরিক আইনের ধারাগুলো পুনর্বার ঘোষণা করা হলো। প্রেস সেন্সরশিপ জারি করা হলো এবং সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগ দিতে আদেশ করা হলো। সমস্ত ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বলা হলো।

অলৌকিকভাবে শহরে জীবন ফিরে এলো এবং সেই সঙ্গে দেখা গেল আর্তি, ভয়, আশঙ্কা। দশটার দিকে দেখা গেল রাস্তাগুলো লোকজনে ভরে গেছে, সবাই শহর ত্যাগ করছে। অন্যদিকে তখনও পুরনো শহরের অনেক এলাকা এবং দূরে শিল্প এলাকার উপরে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। গাড়ি এবং রিকশা করে, বেশির ভাগ পায়ে হেঁটে জিনিসপত্র হাতে নিয়ে ঢাকার লোকেরা পালাচ্ছিল। দুপুরতক শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে লক্ষাধিকের উপর। ‘আমি বুড়ো লোক, আমাকে একটু পৌঁছে দেবেন’, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে একটু সাহায্য করুন’, ‘আমার ছেলেটাকে আপনার সাথে নিয়ে যান।’

সৈন্যদের কীর্তি নিঃশব্দে এবং কঠিন মুখে দেখতে দেখতে তারা যাচ্ছিল।

সরকারি অফিসগুলো প্রায় শূন্য রইল। কাজে ফেরার আদেশকে উপেক্ষা করে বেশির ভাগ কর্মচারীই গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিল। যারা পালাচ্ছিল না তারা ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরছিল আর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কালো করগেটেড টিন (প্রায় বস্তি এলাকার ছাদের জন্যে ব্যবহার করা হয়।) তুলে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা দেখছিল।

প্রায় প্রত্যেকটি গাড়িই হয় লোকজন নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল নয় রেডক্রসের পতাকা উড়িয়ে মৃত এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল।

তারিমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ সৈন্যদের কনভয়গুলো দেখা দিত। কনভয়গুলোতে সৈন্যরা চোখ মেলে দেখছে, হাসির লেশমাত্র নেই,

বোবা, স্তব্ধ জনতার দিকে, বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরে।

শনিবার বিকেল চারটায় রাস্তাঘাট আবার খালি হয়ে গেল। সৈন্যরা অবার বেরিয়ে এলো আর নিস্তব্ধতা আবার ডানা মেলে দিলো ঢাকার উপর। কিন্তু প্রায় সাথে সাথে আবার গুলিবর্ষণ শুরু হলো। 'চারটের পর যে বের হবে তাকেই গুলি করা হবে', সেদিন আরো রেডিওতে ঘোষণা করা হয়েছিল।

কারফিউ দুমিনিট পর ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ছোটো ছেলে দৌড়ে যাচ্ছিল; তাকে থামিয়ে একজন অফিসার ডালে চারবার চড় কষালো তারপর জিপে করে নিয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে স্থাপিত 'বার' ঢাকা ক্লাবের নৈশ পাহারাদারকে গুলি করা হয় যখন সে ক্লাবের গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল। একদল হিন্দু পাকিস্তানি বাস করত রেসকোর্সের মধ্যেকার মন্দিরে। তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। মনে হয় তারা বাইরে ছিল বলেই প্রাণ হারায়।

বাস্তুত্যাগীরা ফের শহরে ফিরে আসতে লাগল, কারণ বের হওয়ার পথগুলো সেনাবাহিনী আটকে দিয়েছিল। তারা এসে জানালো সৈন্যদের এড়িয়ে গ্রামে যাওয়ার সময় কতজনকে হত্যা করা হয়েছে।

বহুলোক রাস্তা ছেড়ে নদী পথে রওয়ানা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সামনে অন্য বিপদের ঝুঁকি ছিল। যখন কারফিউর সময় হত তখন নৌকা না পেয়ে অনেকে আটকে যেত। শনিবার বিকেলে তখন একদল আটকে গিয়েছিল, পরদিন সকালে সেখানে শুধু রক্তের দাগ খুঁজে পাওয়া গেছে।

কোথাও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিরোধের চিহ্ন নজরে পড়ছে না 'ঐ সব হারামিরা' বলল একজন পাঞ্জাবী পারবে না। 'অবস্থা এখন অনেক ভালো, লেফটেন্যান্ট', 'চেষ্টা করলেও আমাদের মারতে জানালো একজন অফিসার, কেউ কথা বলতে পারছে না বা বের হতে পারছে না। আর তারা যদি তা করে তবে তাদের হত্যা করব– তারা অনেক বকেছে– তারা সব বিশ্বাসঘাতক: আমরা নই। আমরা আল্লাহ এবং ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে যুদ্ধ করছি।'

পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের এখনও পদানত রাখতে চায়

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা সিড্‌নি এইচ্ শ্যানবার্গ উপরোক্ত শিরোনামে ১৯৭১ সালের ১৪ই জুলাই তাঁর পত্রিকায় লেখেন:

এখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীর প্রায় শূন্য রাস্তায় সেনাবাহিনীর ট্রাক গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। ঐ সব ট্রাকে ভর্তি বন্দিরা তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কঠিন শ্রম করবার জায়গাগুলোতে। তাদের মাথা কামানো, তাদের পায়ে কোনো জুতো নেই, পরনে শুধু জাঙ্গিয়া, সব মিলিয়ে পালানোটা দুরূহ।

প্রতিদিন রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্লেনগুলো উড়ে আসতো। প্লেনগুলো সৈন্য ভর্তি, পরনে তাদের উপজাতীয়দের মতো ঢোলা পাজামা, যাতে করে তারা সহজে ধরা না পড়ে।

বাঙালি সংস্কৃতিকে দমন করার অভিযানের একটি অংশ হিসেবে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুদের নামাঙ্কিত রাস্তাগুলোর নাম পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। শাঁখারী বাজার এখন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট জেনারেলের নামানুসারে 'টিক্কা খান রোড', যাকে বাঙালিরা নাম দিয়েছে 'কসাই' বলে।

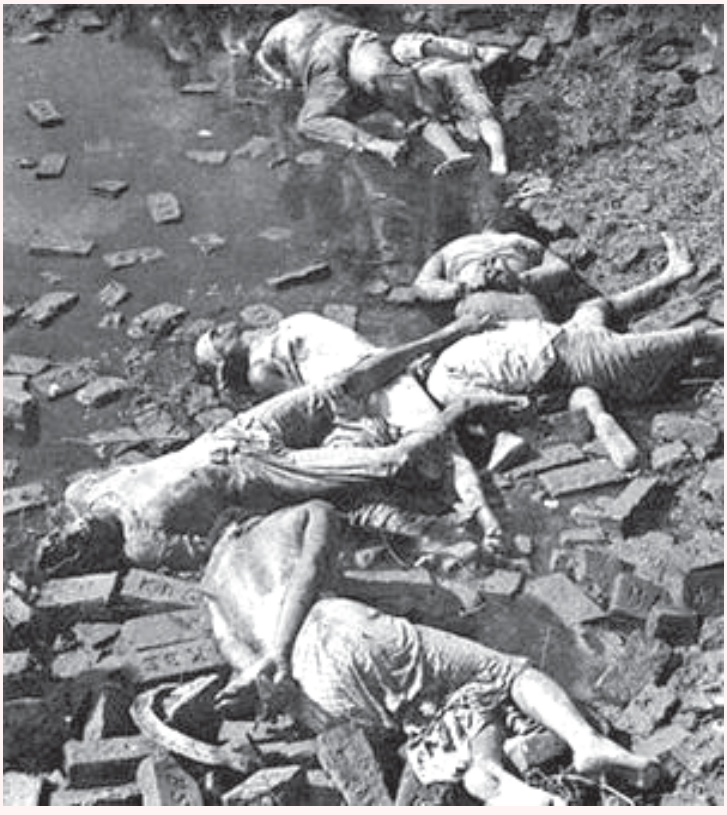

অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে এগুলো হলো কয়েকটি যেগুলো এই সংবাদদাতা পূর্বাঞ্চলে সাম্প্রতিক সফরের সময় দেখেছেন। পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা এই অঞ্চল তাদের দখলে রাখতে এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষেকে পদানত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পঙ্গু অর্থনীতি, সরকারি প্রশাসনের ভাঙন, বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ক্রমবর্ধমান গেরিলা তৎপরতা, ক্রমবর্ধমান সৈনিকদের মৃত্যু এবং বিচ্ছিন্ন বিষণ্ন জনসাধারণের নীরব প্রতিবাদ সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা অমন করছে। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে সরকার দুটি ৭০৭ বোয়িং ভাড়া নিয়েছিল এক বছরের জন্যে কোনো একটি আইরিস মালিকানাধীন বিমান সংস্থা থেকে। ঐ বিমান সংস্থার নাম 'ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজ'। বিমান দুটো ভাড়া করা হয়েছিল সত্তর হাজার থেকে আশি হাজার সৈনিক বৃদ্ধি এবং হতাহতদের স্থান পূরণের জন্যে।

প্রতিদিন সামরিক বাহিনীর আগমন ছাড়াও, কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানিদের জায়গায় কাজ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অনছে। দায়িত্বশীল কাজের জন্যে কোনো বাঙালিকে বিশ্বাস করা হচ্ছে না, এমনকি ঢাকা বিমানবন্দরে যে লোকটি ঘাস কাটে সেও অবাঙালি।

বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রায় নাই। তাদের চাকরিগুলো দেওয়া হয়েছে ভারত থেকে আগত অবাঙালি মুসলমান বাস্তুত্যাগীদের যেমন বিহারি, যারা নিজেদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে একাত্ম মনে করে। সরকারের পক্ষাবলম্বনও করছে তারা এবং খোঁজখবর দিয়ে সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কাজ চালাচ্ছে।

পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষা ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করছে এবং বাংলার পরিবর্তে নিজেদের ভাষা উর্দুকে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছে। সৈন্যরা অবজ্ঞাভরে বাঙালিদের বলে, তাদের ভাষা সভ্য জাতির ভাষা নয় এবং তারা যদি ঠিকঠাক মতো বেঁচে-বর্তে থাকতে চায় তবে তাদের ছেলেমেয়েদের উর্দু শেখানো উচিত। ব্যবসায়ীরা ভয়ে তাদের বাংলা সাইনবোর্ড ইংরেজিতে পাল্টিয়ে নিচ্ছে: তারা উর্দু জানে না।

সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে, সামরিক বাহিনী নতুন এক প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনীকে ট্রেনিং দিচ্ছে যাকে সহজ কথায় বলা যায় 'অনুগত' নাগরিকদের অস্ত্রে সজ্জিত করছে। এদের মধ্যে অনেকে আবার শান্তি কমিটির সদস্য। বিহারি এবং অন্যান্য অবাঙালি, উর্দুভাষী মুসলমান ছাড়াও এই কমিটিতে আছে অল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলমান যারা বহুদিন থেকে সামরিক বাহিনী অনুরাগী ডানপন্থি ধর্মীয় দল, যেমন মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর সমর্থক।

বাংলাদেশের প্রতি অনুগত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাথমিক স্তরের প্রতিরোধ সংগ্রাম স্বল্পকালের মধ্যেই স্তব্ধ করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম বর্তমানে নবশক্তি সঞ্চয় করছে ভারতীয় সীমানার আশ্রয়স্থল থেকে, নতুন লোক এবং সরবরাহ নিয়ে ভিয়েতনামি কায়দায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু করছে বাঙালিরা এখন, যা সামরিক বাহিনীতে ক্রমবর্ধমান ত্রাসের সঞ্চার করছে।

পূর্ব পাকিস্তানের দুরাতিগম্য জায়গায় যে সব বিদেশি মিশনারিরা আছেন তাঁরাও প্রতিদিন নতুন নতুন হত্যাযজ্ঞের কাহিনি জানাচ্ছেন। জনৈক মিশনারি জানিয়েছেন, দক্ষিণে বরিশাল জেলার সম্প্রতি সেনাবাহিনী একদিনে এক হাজার হিন্দুকে হত্যা করেছে। আরেকটি বিবরণীতে বলা হয়েছে উত্তর-পূর্বে সিলেট জেলায় একটি শান্তি কমিটি কোনো এক অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার নাম করে জনসভার আহ্বান জানায়। সবাই যখন সভায় উপস্থিত হলো তখন তিনশো জন হিন্দুকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এবং গুলি করে হত্যা করা হলো।

যখনই একজন বাঙালি প্রকাশ্যে একজন বিদেশির সাথে কথা বলছে তখনই ধরে নিতে হবে সে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে। ফেরি পার হবার সময় বাঙালিরা এই সংবাদদাতার গাড়ির কাছে এসে চুপিচুপি সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুরতার সংবাদ দিয়েছে, অথবা মৃদু হেসে মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের অভিযানের সংবাদ জানিয়েছে।

যখনই ছয়-সাত জন লোক একত্রিত হয় তখনই সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি একজন সৈন্য বা পুলিশ এসে বাঙালিদের গালিগালাজ করে ও তারাও সরে পড়ে।

সামরিক বাহিনী ও তাদের চরদের উপস্থিতি সত্ত্বেও বাঙালিরা বিদেশিদের গাড়িতে একটু করে কাগজে 'নোট' লিখে ফেলে দিয়ে বা গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে তাদের কাহিনি শোনাবার পথ করে নিচ্ছে।

ঢাকা থেকে অনতিদূরে এক শহরে এমনি এক সাক্ষাতকারে এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন যে, তাকে একদিন বিনা কারণে সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়, তার টাকা-পয়সা এবং ঘড়ি কেড়ে নেয় ও অলৌকিকভাবে মুক্তি পাওয়ার আগে তাঁকে পুলিশ থানায় নিয়ে এক রাত্রির জন্যে জেলে রাখে।

ব্যবসায়ীটি জানিয়েছেন, সারারাত তিনি প্রার্থনা করে ও দেয়ালে পূর্ববর্তী বন্দিদের লেখা পড়ে কাটিয়েছেন। লেখাগুলো, তিনি জানিয়েছেন, সব একই রকমের: নিজের নাম ও বন্দির ঠিকানা ও তার গ্রেপ্তারের তারিখ দেওয়া আছে এবং সাথে লেখা আছে, 'আমি হয়ত নাও বাঁচতে পারি। দয়া করে আমার পরিবার-পরিজনকে বলবেন আমার ভাগ্যে কি ঘটেছিল।'

এখন পর্যন্ত তাদের একজনেরও খবর পাওয়া যায়নি, ব্যবসায়ীটি বললেন।

সেনাবাহিনী গণহত্যার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে ধ্বংসকরণও সাধন করেছে বিষয়-সম্পত্তির। গ্রামের দিকে কখনও কখনও এক টানা

মাইলের পর মাইল রাস্তার দুপাশের গ্রামগুলোকে পুড়িয়ে মাটির সাথে সমান করে দেওয়া হয়েছে। শহরের এবং নগরের বিরাট এলাকা প্রবলভাবে গুলি বর্ষণ করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। বাঙালিরা বলছে, সেনাবাহিনী শুধু শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে ধ্বংস করে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী বলছে, তাদের দিকে গুলি ছোঁড়া না হলে তারা গুলি ছোঁড়ে না, কিন্তু কিছু কিছু ফিল্ড কমান্ডাররা গর্ব করে বলেন প্রায় শহরগুলোতে হয় সামান্য প্রতিরোধ ছিল, নয় ছিল প্রতিরোধহীন।

কেন এই ধ্বংসযজ্ঞ?– তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের বাঁধাধরা জবাব, এসব কিছু করছে, 'দুষ্কৃতিকারীরা।'

যদিও অনেক বাঙালি জনবহুল অঞ্চলগুলোতে ফিরে আসছেন, প্রায় শহরগুলোতে আসল জনসংখ্যার হয় অর্ধেক নয় অর্ধেকেরও কম লোক আছে এবং কিছু কিছু অঞ্চলে, যেমন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে।

তারা কয়েকটি পাটের বার্জ ডুবিয়ে দিয়েছে।

কিছু কিছু অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি ক্রমশই চরম আকার ধারণ করছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে সামরিক বাহিনী যদি বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা আবার জোড়া লাগাতে না পারে তবে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা বোধ হয় সম্ভব হবে না, কেননা বাঙালিদের প্রতিরোধ সংগ্রাম রুমেই দুর্বার আকার ধারণ করছে। যদিও ঐ প্রতিরোধ এখনও বিশৃঙ্খল তবুও মনে হচ্ছে ভারতের আশ্রয়, সাহায্য এবং কোনো কোনো সময় সহায়ক গোলাবর্ষণের সুযোগে ঐ প্রতিরোধ ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছে।

হাজার হাজার তরুণ বাঙালিকে ভারতীয় সীমানার ভিতর গেরিলা যুদ্ধ ও ধ্বংসকরণের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ভারতীয়রা এ ব্যাপারে অনেক প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য করছে। নতুন গেরিলাদের পথম ফল এখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসছে।

অযত্নের ফলে ধানের ক্ষেতগুলোকে আগাছা ঢেকে দিচ্ছে। পাট ক্ষেতে যেখানে আগে দিনে ডজন খানেক মজুর কাজ করত এখন সেখানে কয়েকটি নুয়ে পড়া পিঠ মাত্র নজরে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের পাট দিয়ে মজবুত থলে প্রস্তুত করা হয় এবং ঐ পাট হলো জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন ও একমাত্র প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রব্য। যে সব চিহ্ন এখন পরিস্ফুট তাতে দেখা যায় সামনের ফসল আশংকাজনকভাবে কম হবে।

আর ফসল যদি ভালোও হয় তবুও পাটের কারখানাগুলো কাজ করতে পারবে না, কেননা তাদের অধিকাংশ দক্ষ শ্রমিক পালিয়ে গেছে। তাদের উৎপাদন অত্যন্ত কম।

নদীপথে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অব্যাহত। সেনা চলাচল বন্ধ ও উৎপাদিত পাট মিলে যাতে পৌঁছাতে না পারে তার জন্যে তারা সচেষ্ট। যশোর খুলনা অঞ্চল বা পাটে সমৃদ্ধ, সেখানে ইতোমধ্যে রাস্তা ও রেলসেতু এবং বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কেন্দ্রগুলো উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সব ধ্বংসকরণের কাজে গেরিলারা সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে। রাস্তায় মাইন একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদাসতর্ক সেনাবাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করার জন্যে স্থানীয় ঠিকাদারদের পাচ্ছে না; সুতরাং তারা শ্রকিদের জোর করে ধরে এনে কাজ করাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে ফল হচ্ছে না।

কুমিল্লার বাইরে, কিছুদনি আগে গেরিলারা একটি রেলসেতু উড়িয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর প্রহরায় একটি মেরামতকারী ট্রেন পাঠানো হয়। গেরিলারা প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ ট্রেন আক্রমণ করে, ফায়ারম্যানকে হত্যা করে এবং একজনকে বন্দি হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। ট্রেনটি দ্রুত শহরের দিকে ফিরে আসে।

[বাংলাদেশ: প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে সংগৃহীত]

মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমাত্রিক অবদান

ড. আফরোজা পারভীন

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ছিল বহুমাত্রিক। সবচেয়ে বড়ো অবদান স্বামীকে বা বুকের সন্তানকে যুদ্ধে যেতে দেওয়া। যে নারীরা এমন কাজ করেছেন তাঁদের অনেকেই স্বামী, সন্তানহারা হয়েছেন, সম্ভ্রম হারিয়েছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা উজ্জ্বলভাবে লেখা হয়েছে, নারীর কথা সেভাবে লেখা নেই। অনেকেই হারিয়ে গেছেন কালের গর্ভে। অনেকে স্বীকৃতি না পেয়ে অভিমানে, অনুযোগে নিজেদের লুকিয়ে রেখে জীবনের ওপারে চলে গেছেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুলের সেই অমর বাক্য আবারও উচ্চারণ করতে হয়:

কোন রণে কত খুন দিলো নর
লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিলো সিঁথির সিঁদুর
লেখা নেই তার পাশে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী শুধু সিঁথির সিঁদুরই দেননি, পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ করেছেন, তাঁদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় আর প্রশ্রয় দিয়েছেন, আদর-যত্ন করেছেন। পাকিস্তানি আর তার দোসরদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে খাবার রান্না করেছেন, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তথ্য সরবরাহ করেছেন, সেবা শুশ্রূষা করেছেন, অভয় দিয়েছেন। চেনা-অচেনা শরণার্থীদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, খাইয়েছেন, পরিয়েছেন আপনজনের মতো। এর কোনোটিই কম নয়। এসব কাজ শুনতে ছোটো, কার্যত এসব ভূমিকার মূল্য নিরূপণ করা যায় না। প্রবাসেও নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

নারী সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের অনেকের কথাই হয়ত আজও অজানা রয়ে গেছে। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়নি। অনেকে মারা গেছেন। অনেকে বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে গেছেন। আমরা তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, ফোরকান বেগম, শিরিন বানু, মিতিলসহ আরও অনেককে পেয়েছি। কিন্তু বাস্তব সংখ্যা অনেক বেশি। নারী ছদ্মবেশ নিয়েছেন, গেরিলা তৎপরতা চালিয়েছেন, পাকিস্তানিদের অস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আহত হয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। শত শত নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন তবু মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পাকিস্তানিদের বলে দেননি। এই সাহসী নারীরা অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। তাই, মুক্তিযুদ্ধে নারীর বহুমাত্রিক অবদান অনস্বীকার্য।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নারীর অবদান

স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক নারী সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: তারামন বিবি, কাঁকন বিবি, খালেদা

খানম, রিজিয়া চৌধুরী, মমতাজ বেগম, করুণা বেগম, রানী, বীথিকা বিশ্বাস, শিশির কণা, সাহানা, আশালতা, মেহেরুন নেছা, মনোয়ারা বেগম, সালেহা বেগম, পেয়ারা চাঁদ প্রমুখ। খালেদা খানম মাদারীপুর ও শরীয়তপুর এলাকায় কাজ করেছেন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি স্থানীয় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে থানা আক্রমণ করেছিলেন। তারামন বিবি ১৮ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত রাজীবপুর, মোহনগঞ্জ, আগরতলা প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বাঙালি নারীর পাশাপাশি অনেক আদিবাসী নারীও মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। এসব নারী যোদ্ধা দেশের বিভিন্ন অংশে অপারেশনে অংশগ্রহণ করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যেমন– কাঁকন বিবি, তুসি হারদিক প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে নারী

যুদ্ধকালে নারীদের প্রাণশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁদের যুদ্ধ এবং সেবাদানের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। সে কারণে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অবস্থান ছিল কলকাতার গোবরা এলাকায়। এই ক্যাম্পগুলোতে নারীদের সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও সশস্ত্রযুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এছাড়াও প্রতিদিন রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। উদ্দেশ্য ছিল সবার মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা। এসব ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছু নারী সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, কেউ কেউ সেবাদানের কাজে নিয়োজিত হন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন, কেউ জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। প্রায় চরশো জন নারী মুক্তিযোদ্ধা এইসব ক্যাম্পে সশস্ত্র যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অত্যন্ত সাহসী, অকুতোভয় নারীদের উচ্চতর গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আগরতলা ক্যাম্পে। নারী গেরিলা স্কোয়াড ট্রেনিংয়ে প্রথম ৮ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে আমেনা সুলতানা বকুল অন্যতম।

মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান

সারাদেশের নারীরাই যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণেও তাঁরা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। আশ্রয় দিয়েছেন শহরবন্দর, গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবশ্রেণির নারী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজের শোবার ঘর, বাথরুম বা গোলাঘরে লুকিয়ে রেখে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের খাবার দিয়েছেন অনেক সময় নিজে না খেয়ে। তাদের অস্ত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র তারা খুব যত্নের সঙ্গে ঘরের চালের ওপরে, মুরগির খোয়াড়ে, বিছানার নীচে, মাটির তলায়, বাথরুমে ও আলমারিতে লুকিয়ে রাখতেন। পরবর্তীকালে সময়মতো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতেন।

সেবা প্রদানে নারী

নারীরা অসুস্থ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং বা সেবা দিয়েছেন। সীমান্ত অঞ্চল ও মুক্তাঞ্চলে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। সেসব হাসপাতালে নারীরাই কাজ করতেন। এদের নার্সিং-এর ওপর কোনো পূর্ব প্রশিক্ষণ ছিল না। কিন্তু সেবাধর্ম নারীর সহজাত। সেই সহজাত প্রবৃত্তি আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব নারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা

করতে এগিয়ে আসতেন। বেশ কয়েকজন নারী চিকিৎসকও মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় এগিয়ে এসেছিলেন। ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ১৯৭১ সালে কুমিল্লা সিএমএইচ-এ কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ২ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ ফিল্ড হাসপাতালে যোগ দেন। ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস শরণার্থী শিবির ও প্রশিক্ষণ শিবিরে চিকিৎসা ও সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

তথ্য আদান-প্রদানে নারীর অবদান

যে-কোনো বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান একটি জরুরি কাজ। কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে যুদ্ধকালে তথ্য আদান-প্রদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অনেক সাহসী নারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় গোপনে লিফলেট, পত্রিকা ছাপিয়েছেন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবীদের চিঠিপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন উপায়ে পাকিস্তানিদের আগমন-নির্গমনের খবর সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়েছেন। অনেক নারী যৌনকর্মী রাজাকার ও পাকিস্তানি আর্মিদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করেছেন।

জনমত গঠনে অবদান

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অনেক নারী। দেশের ভেতরে অনেকে এ কাজ করেছেন, অনেক স্বাধীনতাকামী নারী দেশের বাইরে থেকেও জনমত গঠনে অবদান রেখেছেন। দেশি-বিদেশি নারী, লন্ডন প্রবাসী বাঙালি ও ভারতীয় নারী, বাংলাদেশ নারী সমিতি বিভিন্ন সভার আয়োজন করে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে জনমত গড়ে তোলেন। মিসেস নুরজাহান মুর্শেদ এম.এন.এ. বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি সদস্য হিসেবে বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ সফর করে সেসব স্থানে পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি তাদের অবহিত করেন। প্রতিটি স্থানে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠনকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ, বেগম রাফিয়া আক্তার, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, রেখা সাহা প্রমুখ।

অনুপ্রেরণাদাত্রী হিসেবে নারী

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অনুপ্রেরণা ছিল মুক্তিকামী মানুষের বড়ো শক্তি। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মা, বোন, স্ত্রীরা অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সে ত্যাগের কথা কোনো ভাষাতেই বর্ণনা করা সম্ভব না। অনেক মা তাঁর ছেলেকে স্বেচ্ছায় মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন। শহিদজননী জাহানারা ইমাম এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই মহীয়সী নারী তাঁর বড়ো ছেলে রুমীকে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণ করেন। রুমী মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। দেশের জন্য আত্মাহুতি দেন। জাহানারা ইমামের মতো অসংখ্য মা তাঁদের বুকের ধনকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সন্তান ফিরবে কি ফিরবে না– সেই অনিশ্চয়তা নিয়েও পিছপা হননি। অনেকেই ফেরেননি। এ ত্যাগের কোনোই তুলনা হয় না।

প্রচার মাধ্যমে নারী

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিকামী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদের মনে বিজয়ের আশার আলো জাগাতে বেতার মাধ্যম, পত্রিকা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বেতারে দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কবিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন দেশের জনপ্রিয় নারী সংগীতশিল্পী, নাট্যকর্মী, সংবাদ পাঠিকারা।

কূটনৈতিক দায়িত্বে নারী

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলাদেশের নারীসমাজ ও দেশি-বিদেশি নারী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এগিয়ে এসেছিলেন। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংগঠক হিসেবে তারা কাজ করেছেন। এদের মধ্যে লুলু বিলকিস বানু (বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি, লন্ডন), শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুন্নী রহমান, আমিনা পল্লী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় নারী ফেডারেশনের অরুণা আসাফ আলী, রেনু চক্রবর্তী, বিমলা ফারুকা, গীতা মুখার্জী, বীণা গুপ্তা, ইলামিত্র প্রমুখ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সভা-সেমিনারের আয়োজন ও প্রচার কাজে নিয়োজিত থেকে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন করেন এবং কূটনৈতিক তৎপরতা চালান।

মুক্তিযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে নারীর ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধকালে যোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা এবং জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশের বাইরে ভারতের বিভিন্ন শহর ও সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত শরণার্থী ক্যাম্পে।

কাঁকন বিবি

তারামন বিবি

জাহানারা ইমাম

ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র কথা। বেতারে ভেসে আসা শব্দ বুলেটের চেয়েও শক্তিশালী তা প্রমাণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছেন, পাশাপাশি বেতার কেন্দ্রের শব্দযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন কণ্ঠ দিয়ে। এ যুদ্ধ চলেছে দেশ স্বাধীন হবার দিন পর্যন্ত। তাঁদের অস্ত্র ছিল কণ্ঠ, গান, কবিতা, কথিকা, নাটক আর বাদ্যযন্ত্র।

বেতার কেন্দ্রটির সূচনালগ্ন থেকেই কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন নারীরা। বেতার কেন্দ্রের প্রথম অধিবেশন সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডা. মঞ্জুলা আনোয়ার, কাজী হোসনে আরা এবং বেগম মুশতারী শফী।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, বর্বরতার করুণ চিত্র তুলে ধরা হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। একইসঙ্গে প্রচার করা হতো মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্যবীর্যের কথা। কয়জন পাকিস্তানি মারা পড়ল, মুক্তিযোদ্ধারা কয়টা ব্রিজ কালভার্ট উড়াল, কয়টা বিমান ভূপতিত করল এসব খবরে উল্লসিত হয়ে উঠত পরাধীন দেশের জনগণ। এছাড়াও যুদ্ধকালীন সার্বিক পরিস্থিতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া দেশবাসীকে নিয়মিত জানাতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠক-পাঠিকারা ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, একনিষ্ঠ। দায়িত্ব পালনে এতটুকু ত্রুটি ছিল না তাঁদের। সংবাদ পাঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন নাসরীন আহমাদ (জেরীন আহমাদ), মিসেস টি হোসেন (পারভীন), দীপ্তি লোহানী, তাজিন শাহনাজ মুরশিদ। সংবাদ পর্যালোচনা পাঠ করতেন শেফালী দাস।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্রুত ব্যাপ্তি ঘটেছিল। একটি পূর্ণাঙ্গ বেতারে রূপান্তরিত হয়েছিল কেন্দ্রটি অল্পসময়ের মধ্যেই। প্রচার সময় বৃদ্ধি পেয়েছিল। নাটক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জনপ্রিয় একটি ধারাবাহিক নাটিকা ছিল 'জল্লাদের দরবার'। এই নাটকে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে তুলে ধরা হতো। এই ব্যঙ্গাত্মক সিরিজে তাকে কেল্লা ফতেহ খান চরিত্রে চিত্রিত করা হয়। অপর দুটি জীবন্তিকার শিরোনাম ছিল 'জনতার আদালত' ও 'মীর জাফরের রোজনামচা'। নাট্যশিল্পী হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন বুলবুল মহলানবীশ, অমিতা বসু, আলেয়া ফেরদৌসী, মাধুরী চ্যাটার্জী, শিল্পী মহলানবীশ, সুমিতা দেবী, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, শুক্তি মহলানবীশ, সুফিয়া খাতুন, দিলশাদ বেগম, তাজিন শাহনাজ মুরশিদ, উম্মে কুলসুম, করুণা রায়, মাসুদা নবী, ব্লুনু আহমেদ, কাকিয়া বসু, মালা চৌধুরী।

কেন্দ্রে কথিকা রচনা ও পাঠের সঙ্গেও নারীদের সম্পৃক্ততা ছিল। কেন্দ্রের শুরুর দিকে প্রতি সোমবার সকাল ৭.৩৫ মিনিটে প্রচারিত হতো 'রণাঙ্গনে বাংলার নারী', সোমবার ছাড়া প্রতিদিন একই সময়ে 'মুক্তিসংগ্রামে মায়ের ভূমিকা' শীর্ষক কথিকা প্রচারিত হতো। পরে এই অনুষ্ঠানটি পরিবর্তন করে ৭.৪০ মিনিটে ৭ মিনিট ব্যাপী 'দেশগঠনে নারীর ভূমিকা' নামে কথিকা পাঠ করা হতো। কথিকা রচনা ও পাঠে সম্পৃক্ত ছিলেন উম্মে কুলসুম (বেগম মুশতারী শফী), জেবুন্নাহার আইভি (আইভি রহমান), বদরুন্নেসা আহমদ, মেহের খন্দকার (সেলিনা খন্দকার), দীপা ব্যানার্জী, শুভ্রা চৌধুরী, পারভীন আক্তার (বুলা মাহমুদ), কুলসুম আজাদ, জলি জাহানুর, বাসনা গুণ, নূরজাহান মাজহার, ডলি নাথ, দীপ্তি লোহানী, নুরুন নাহার জাহুর, রাফিয়া আখতার ডলি, ড. মাহমুদা খাতুন, রেবা আখতার, ড. সুলতানা সারোয়ার জামান। তাদের রচিত কথিকাগুলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাংলার নারী-পুরুষনির্বিশেষে সকলকে মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তেমনি অবরুদ্ধ দেশে মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধপন্থি ও সাধারণ জনতার মনোবল বৃদ্ধিতে অসাধারণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রধানত দুই ভাগে পরিচালিত হতো। একটি তথ্য বিভাগ ও অন্যটি সংগীত বিভাগ। সংগীত শাখার প্রধান কাজ ছিল উদ্দীপনামূলক গান প্রচার করে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বদেশবাসীকে প্রেরণা জোগানো। এই লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নতুন নতুন গণসংগীত। মানুষকে জাগানোর জন্য স্বদেশি গান, রবীন্দ্রসংগীত, মকুন্দ দাসের গান, নজরুল সংগীতসহ জনপ্রিয় গানগুলো নির্বাচন করে ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হতো। সংগীত বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন নমিতা ঘোষ, বুলবুল মহলানবীশ, মালা খান খুররম, কল্যাণী ঘোষ, রূপা খান (ফরহাদ), শাহীন সামাদ, শীলা ভদ্র, শীপ্রা ভদ্র, শুক্লা ভদ্র, ঝর্ণা ব্যানার্জী, লীনা দাস,

সাকিনা বেগম, দীপা ব্যানার্জী, কণিকা রায়, মিনু রায়, মিতা চ্যাটার্জী, মলিনা দাস, সুফিয়া খাতুন, দিলশাদ বেগম, অর্চনা বসু, কণা, মিতা ঘোষ, ডালিয়া নওশীন, ফ্লোরা আহমেদ, ভক্তি রায়, মাধুরী আচার্য, মিতালী মুখার্জী, মিলিয়া গণি, শীলা দাশ, শক্তি শিখা দাস, শেফালী ঘোষ, ছন্দা, শর্মিলা দাশ, হেনা বেগম, পূর্ণিমা দাস, সৈয়দা নাজনীন নীনা, রেহেনা বেগম, নীলা দাশ, জয়ন্তী লালা, কুইন মাহজাবীন, রানী প্রভা চৌধুরী, রানা হায়দার, দেবী চৌধুরী, আরতী ধর, সন্‌জীদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, স্বপ্না রায়, রমা ভৌমিক, লায়লা জামান, মঞ্জুলা দাসগুপ্ত, উমা চৌধুরী, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, অনিতা বসু, রেহানা বেগম, শেফালী সান্যাল, অরুণা রানী সাহা, গীতশ্রী সেন, আফরোজা মামুন প্রমুখ। এই শব্দ সৈনিকরা সমবেতভাবে 'নোঙ্গর তোলো তোলো', 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবে', 'স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে', সহ অসংখ্য গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। নারী শব্দসৈনিকদের মধ্যে কাজী রোজী, বেগম মুশতারী শফী, লায়লা হাসান আবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পাঠ, কথিকা রচনা ও পাঠ, নাটক, সংগীত, আবৃত্তি ও সাহিত্য আসর সকল ক্ষেত্রেই নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এপ্রিল মাসে সন্‌জীদা খাতুনের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। এই শিল্পী সংস্থার সদস্যরা শুধু কলকাতায় নয়, বিভিন্ন সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবির ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে গিয়ে গান শোনাতেন। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির উদ্যোগে বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশকে সহযোগিতার জন্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি'। এই সমিতিই পরবর্তী সময়ে গঠিত মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার উৎস। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সঙ্গে নারীদের মধ্যে যুক্ত ছিলেন সন্‌জীদা খাতুন, বুলবুল মহলানবীশ, শুক্তি মহলানবীশ, ফ্লোরা আহমদ, শারমিন সোনিয়া মুর্শীদ, ডালিয়া নওশিন, দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, মঞ্জুলা দাসগুপ্ত, ঝর্ণা ব্যানার্জি, অর্চণা বসু, শাহীন সামাদ, অরুণা রাণী সাহা, শান্তি মুখার্জি, কল্যাণী ঘোষ, মিঠু চক্রবর্তী, উমা চৌধুরী, শীলা দাশ, শর্মিলা দাশ, নীলা দাশ, রাখী চক্রবর্তী, সুমিতা নাহা, তাজিন মুরশিদ, লায়লা জামান, লতা চৌধুরী, লুবনা জাহান, মিলিয়া গণি প্রমুখ। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই শিল্পী সংস্থার সদস্যরা কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকায় চড়ে, আবার কখনও ট্রাকে করে এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে যেতেন মুক্তিযোদ্ধাদের গান শুনাতে। ট্রাকই হয়ে উঠেছিল শিল্পীদের বাসস্থান। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা ২৫০টির বেশি অনুষ্ঠান করেছিলেন। দিল্লির একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও এই সংস্থা 'রূপান্তরের গান' পরিবেশন করেছিলেন। গানের পূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। তাই এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের এই সংগ্রাম বিশ্ববাসীর চেতনায় আঘাত হানতে সক্ষম হয়। মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার ব্যানারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলোতে 'জনতার সংগ্রাম চলবে', 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য', 'বিপ্লবের রক্ত রাঙা ঝান্ডা উড়ে আকাশে', 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল', 'মানুষ হ মানুষ হ, আবার তোরা মানুষ হ', 'ওরে বিষম দৈরার ঢেউ উথাল পাথাল করে', 'মোদের গরব মোদের আশা', 'শিকল পরা ছল মোদের এই', 'কারার ঐ লৌহ কপাট' প্রভৃতি গান পরিবেশন করা হয়। এই সকল গানের মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ, শিশু, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। এ যুদ্ধে জয় সবার যৌথ প্রচেষ্টার ফল। তাই এককভাবে কাউকে কৃতিত্ব দেওয়া সম্ভব না। না পুরুষকে না নারীকে। সবার অবদান সমান। এ সত্য অনস্বীকার্য। তবে নারীর অবদান অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বহুমাত্রিক। এমন বহুমাত্রিক অবদান আর কারও ছিল না। সেই উজ্জ্বল অবদানকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করা উচিত। নারীর অবদানকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি প্রয়োজন।

ড. আফরোজা পারভীন: কথাশিল্পী ও গবেষক

ঈদে বিনামূল্যে চাল পাবে এক কোটি পরিবার

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপহার হিসেবে ঈদ উপলক্ষে এক কোটি নিম্নবিত্ত পরিবারকে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হবে। এছাড়া দেশের ৫০ লাখ পরিবারকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় আগামী মার্চ ও এপ্রিল মাসে ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়া হবে। খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার ২৭শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার রমজান মাসে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে এ বরাদ্দকৃত চাল সঠিকভাবে বিতরণের বিষয় নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য ঢাকা বিভাগের সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেন। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং ওএমএসের মাধ্যমে চাল বিতরণে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা জেলা প্রশাসকরা উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। উপদেষ্টা কিছু সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেন এবং অবশিষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

প্রতিবেদন: শহিদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধে সংগীত বিপ্লব

সাঈদ সাহেদুল ইসলাম

সংগীত মানেই সেখানে দোলা থাকে, একটা ঝাঁকুনি থাকে। সেই ঝাঁকুনিতে মানুষের নিদ্রা ভাঙে আর মানুষ জেগে ওঠে। সুতরাং মানুষকে অনুপ্রাণিত ও আন্দোলিত করতে সংগীত এক বিরাট শক্তির আধার হিসেবে কাজ করে। যে- কোনো লেখনী পড়তে হলে সেটা হাতে নিয়ে এবং চোখে দেখে পড়তে হয়, কিন্তু সংগীতকে হাতে নিতে হয় না, চোখে দেখতে হয় না। যে কেউ যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন তার কানে সংগীতের সুর এসে তাকে সরাসরি জাগাতে পারে। তাই মানুষের সঙ্গে সংগীতের সংযোগ হয় একেবারে প্রত্যক্ষভাবে। আবার যে-কোনো লেখনীকে চোখে দেখে এবং পড়ে মুখস্থ করতে হয়, কিন্তু সংগীতকে মুখস্থ করতে না চাইলেও তার সুর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায় এমনিতেই। তাই মানুষকে অতি সহজে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সংগীতের অদৃশ্য শক্তি রয়েছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং রক্তত্যাগের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা ও বিজয় অর্জন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান প্রেরণা দেয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে। সেই সাথে শিল্পীদের সংগীতও আন্দোলন হয়ে বিপ্লব আনে মুক্তিযুদ্ধে। বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগীত মানুষকে উজ্জীবিত করে ব্যাপকভাবে। সামাজিক, রাজনৈতিক যে-কোনো আন্দোলনে একটি দেশের জনগণের সঙ্গে সংগীতের গভীর সম্পর্ক তাই অনেক গুরুত্ব বহন করে। ধরুন, 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়/ ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে পায়।' এমন গানটি শুনলে মাতৃভাষাকে রক্ষায় কে আর স্থির থাকতে পারে? ভাষা থেকে সংগীত, সংগীত থেকে অনুপ্রেরণা আর অনুপ্রেরণা থেকে ত্যাগ আর ত্যাগ থেকে বিজয়। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষের চেতনার জাগরণ আনে সংগীত। এমন জাগরণী সংগীত-শক্তির কারণে বাহান্ন সালে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য। বাঙালি তাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে দেয়নি। ২১শে ফেব্রুয়ারি এলেই আমাদের কণ্ঠে ভেসে ওঠে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা ও আলতাফ মাহমুদের সুর করা সেই গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি?'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' স্বাধীনতার আগে রচিত হলেও স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করে গানটি। সেই সাথে ১৯৭১-এর ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ আহূত অসহযোগ আন্দোলন এবং এরই মধ্যে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রচিত সংগীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রেরণা দেয়। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগাতে গীতিকার নঈম গহর লিখেন একটি গান। গানটিতে সুর করেন আজাদ রহমান এবং কণ্ঠ দেন

ফিরোজা বেগম— 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো/ এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো/ তোমার কথায় হাসতে পারি/ তোমার কথায় কাঁদতে পারি/ মরতে পারি তোমার বুকে/ বুকে যদি রাখো আমায়/ বুকে যদি রাখো মাগো ...।' সে সময় রচিত সংগীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ দেশকে স্বাধীন করতে অস্ত্র হাতে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নয় মাস ধরে দেশাত্মবোধক গান, জাগরণী গান, উজ্জীবনের গান এবং গণসংগীত সংগীতের প্রতিধ্বনি জনগণকে উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা দেয়। গীতিকার গোবিন্দ হালদার রচিত গানে সুর করেন সংগীত পরিচালক সমর দাস 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল/ জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল।' এই গানের এক জায়গায় রয়েছে 'ছিঁড়ে ফেলো সব শত্রু জাল শত্রু জাল শত্রু জাল।' গান শুনে মানুষের দেহ-মনে জেগে ওঠে দেশপ্রেম। সুরের ঝংকারে এমন সুন্দর প্রেরণা শুধু সংগীতেই সম্ভব হয় তখন।

দেশে পাকসেনারা ঢুকে নির্বিচারে মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। তাদের অত্যাচার মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা দেশপ্রেমিক। তাদের থেমে থাকলে চলবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত রাখতে কবি সিকান্দার আবু জাফর গান লিখেন। যে গানে সুর করেন শেখ লুৎফর রহমান। শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন– 'জনতার সংগ্রাম চলবেই/ আমাদের সংগ্রাম চলবেই/ জনতার সংগ্রাম চলবেই.../ আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে/ নতুন শিখা জ্বলবেই/ জনতার সংগ্রাম চলবেই।' এই নতুন শিখা আমাদের বিজয়, যা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত।

বাঙালিরা কেন যুদ্ধ করেন? বিশ্লেষণে গান লিখেন গোবিন্দ হালদার। এ গানে সুর ও কণ্ঠ দেন আপেল মাহমুদ 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি/ মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি/...মোরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি/ মোরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি/ মোরা সারা বিশ্বে শান্তি বাঁচাতে যুদ্ধ করি।' আজ আমরা আমাদের স্বাধীন দেশে ফুলের হাসি দেখি, কবিতা লিখি, গান লিখি, বিশ্ব শান্তির পক্ষে কথা বলতে পারি আমাদের স্বাধীনতার জন্য।

শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা আপেল মাহমুদ দেশের আর সব মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে কলম ধরেন। তিনি দেশকে ভালোবেসে, গান লিখে, সুর করে এবং কণ্ঠ দেন সে গানে– 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিব রে/ আমরা ক'জন নতুন মাঝি/ হাল ধরেছি শক্ত করে রে/ ...তবু তরী বাইতে হবে/ খেয়া পাড়ি দিতেই হবে/ যতই ঝড় উঠুক সাগরে।'

বাংলাকে ভালোবেসে গীতিকার শ্যামল গুপ্ত গান লিখেন। গানে বাংলায় ফিরে আসার আকুতি ও মুক্তিযাদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করার মতো উচ্চারণ। গানটিতে সুর করেন অপরেশ লাহিড়ী আর কণ্ঠ দেন মোহাম্মদ আবদুল জব্বার– 'হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে/ বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে.../ শুনছি তোমার ডাকে জীবন ডাকছে যেন/ মরণের সীমানাটা ছাড়িয়ে।'

বাংলাদেশের মাটিতে সোনা ফলে। এ দেশের মাটির মায়া তাই কবি গীতিকারদের চোখে সোনার চেয়েও দামি এবং খাঁটি। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনোৎসর্গ করতে পারা মানে ধন্য হওয়া। গীতিকার, ভাষাসৈনিক ও সুরকার আবদুল লতিফ সেটা উপলব্ধি করে লিখেন গানটি– 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা/ সোনা নয় তত খাঁটি/ বলো যত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি/ বাংলাদেশের মাটি রে/ আমার বাংলাদেশের মাটি।'

মুক্তির আলো দেখেন গীতিকার নঈম গহর। তিনি অনুধাবন করেন দেশের আসন্ন স্বাধীনতার। রচনা করেন জনপ্রিয় এ গানটি এবং এ গানে সুর দেন সংগীত পরিচালক ও সুরকার সমর দাস- 'নোঙ্গর তোল তোল/ সময় যে হলো হলো/ নোঙ্গর তোল তোল.../ হৃদয়ে তোমার মুক্তির আলো/ আলোর দুয়ার খোল/ আলোর দুয়ার খোল।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে দেশের বীর যোদ্ধাদের ত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করতে কলকাতার গীতিকার গোবিন্দ হালদার রচনা করেন একটি গান। রচিত সে গানে সুর দেন শিল্পী আপেল মাহমুদ এবং কণ্ঠ দেন স্বপ্না রায়– 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে/ বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা/ আমরা তোমাদের ভুলব না।'

মুক্তিযোদ্ধার রক্তে রঞ্জিত ইতিহাসকে চিরস্মরণীয় করতে, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা-সালাম জানাতে মুক্তিযোদ্ধা কবি-গীতিকার ফজল-এ-খোদা লিখেন তার অমর গান, যে গানে কণ্ঠ দেন আরেক মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার– 'সালাম সালাম হাজার সালাম/ সকল শহিদ স্মরণে/ আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই/ তাদের স্মৃতির চরণে.../ বাংলাদেশের লাখো বাঙালি/ জয়ের নেশায় চলে রক্ত ঢালি/ আলোর দেয়ালি ঘরে ঘরে জ্বালি/ ঘুচিয়ে মনের আঁধার কালি/ শহিদ স্মৃতি বরণে।'

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অনেক গান বেজে ওঠে সে সময়। তখন সে গানগুলোর প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হোসেন তওফিক ইমাম'র '*বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১' গ্রন্থ থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কিছু গানের যথাক্রমে প্রথম কলি, গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর নাম– ১. 'জয় বাংলা বাংলার জয়'– গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আনোয়ার পারভেজ, শাহনাজ রহমতুল্লাহ (মূলত এটি ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা সংগীত)। ২. 'আমার সোনার বাংলা'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোরাস। ৩. 'কারার ঐ লৌহ কপাট'– কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম, কোরাস। ৪. 'কেঁদো না কেঁদো না মাগো'– (গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই)। ৫. 'সোনা সোনা সোনা'– আবদুল লতিফ, আবদুল লতিফ, শাহনাজ রহমতুল্লাহ। ৬. 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে'– গোবিন্দ হালদার, আপেল মাহমুদ, আপেল মাহমুদ। ৭. 'ঐ বগিলা রে কেন'– হরলাল রায়, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), রথীন্দ্রনাথ রায়। ৮. 'অনেক রক্ত

দিয়েছি আমরা'– টি এইচ শিকদার, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), কোরাস। ৯. 'অত্যাচারের পাষাণ জ্বালিয়ে দাও'– আল মুজাহিদী, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), কোরাস। ১০. 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর'–আপেল মাহমুদ, আপেল মাহমুদ, কোরাস। ১১. 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'– গোবিন্দ হালদার, সমর দাস, কোরাস। ১২. 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে'– গোবিন্দ হালদার, আপেল মাহমুদ, স্বপ্না রায়। ১৩. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'– আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আলতাফ মাহমুদ, কোরাস। ১৪. 'আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা'– নেওয়াজিস হোসেন, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), কোরাস। ১৫. 'সালাম সালাম হাজার সালাম'– ফজল-এ-খোদা, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। ১৬. 'জগৎবাসী বাংলাদেশকে যাও দেখিয়া'– (গীতিকারের নাম উল্লেখ নেই), (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), সরদার আলাউদ্দীন। ১৭. 'সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ'- সারওয়ার জাহান, গীতিকারের নাম উল্লেখ নেই), (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), (শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই)। ১৮. 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম'– শহীদুল ইসলাম, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), কোরাস। ১৯. 'জনতার সংগ্রাম চলবেই'– সিকান্দার আবু জাফর, শেখ লুৎফর রহমান, কোরাস। ২০. 'বিচারপতি তোমার বিচার'– সলিল চৌধুরী, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), কোরাস। ২১. 'আমি শুনেছি আমার মায়ের কান্না'– ফজল-এ-খোদা, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), মান্না হক। ২২. 'নোঙ্গর তোল তোল'– নঈম গহর, সমর দাস, কোরাস। ২৩. 'ব্যারিকেড, বেয়নেট, বেড়াজাল'– আবু বকর সিদ্দিক, (সুরকারের নাম উল্লেখ নেই), কোরাস।

প্রতিটি সৃজনশীল কাজের নেপথ্যে একটি ঘটনা থাকে। 'ছোটোদের বড়োদের সকলের... আমার দেশ সব মানুষের'- এ জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত গানটির নেপথ্য ইতিহাস একটু ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রংপুরে বসবাসকারী তিন বন্ধু বন্দে আলী, মহসিন আলী এবং জেড এ রাজা সাহিত্যচর্চার সুবাদে একদিন চায়ের আড্ডায় মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখে ফেললেন এই গানটি। গানটির গীতিকার হিসেবে তিন বন্ধুর নাম যুক্ত হয় বন্দে আলীর 'আলী'- মহসিন আলীর 'মহসিন' এবং জেড এ রাজার 'রাজা' গীতিকার হিসেবে নাম হলো 'আলী মহসিন রাজা'। আজ তাঁরা কেউ বেঁচে নেই আমাদের মাঝে। শুধু এ গানটিই নয় তিন বন্ধু মিলে বেতারে নাটক রচনাসহ সৃজনশীল অনেক কাজ করেছেন। গানটিতে সুর করে প্রথম কণ্ঠ দেন রংপুরের কৃতি সন্তান খাদেমুল ইসলাম বসুনিয়া এবং খাদেমুল ইসলাম বসুনিয়ার সুরে পরবর্তীতে রথীন্দ্রনাথ রায়ের কণ্ঠে গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত হয়। (তথ্যসূত্র: আশাফা সেলিম, ছড়াকার, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও উন্নয়নকর্মী এবং এসএম খলিল বাবু, ছড়াকার)।

এসব গান ছাড়াও 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা', 'একি অপরূপ রূপে মা তোমার হেরিনু পল্লী জননী' 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'– এমন অনেক গানের কথায় ও সুর আজও মানুষের বুকে জাগরণ সৃষ্টি করে, মানুষের মন কেড়ে নেয়। ঠিক একইভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানগুলো মানুষের মনে বিপ্লব এনে মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগী হতে প্রেরণা জোগায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অর্জনে নেপথ্য শক্তির আধার সংগীত। আমাদের মুক্তির জন্য সে সময় এ সব গানের বিপ্লব অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাঈদ সাহেদুল ইসলাম: প্রাবন্ধিক

মার্চ মাসের জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতিমাসে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাইসিং ফর্মুলার আলোকে চলতি বছরের মার্চ মাসের জন্য তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যমান মূল্য কাঠামো অনুযায়ী ডিজেলের বিক্রয়মূল্য প্রতি লিটার ১০৫ টাকা, কেরোসিন ১০৫ টাকা, অকটেন ১২৬ টাকা এবং পেট্রোল ১২২ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ১লা মার্চ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মার্চ মাসের জন্য তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান মূল্যকাঠামো অনুসারে লিটারপ্রতি ডিজেল ও কেরোসিনের দাম ১০৫ টাকা রাখা হয়েছে। পেট্রলের দাম লিটারপ্রতি ১২২ টাকা ও অকটেনের দাম ১২৬ টাকা রাখা হয়েছে।

গত বছরের মার্চ থেকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ শুরু করেছে সরকার। সে হিসাবে প্রতি মাসে নতুন দাম ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেদন: সাদমান সাকিব

মাসুদুল আলম খান চান্দু

মিয়াজান কবীর

করতোয়া নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে বগুড়া নামের একটি প্রাচীন জনপদ। এক কালের পুণ্ড্রনগর আজকের আধুনিক জেলার নাম বগুড়া। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার রৌহাদহ গ্রামে ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাসুদুল আলম খান। তার ডাক নাম চান্দু। চান্দু নামেই তিনি ছিলেন বেশি পরিচিত। বাবা আব্দুল খালেক খান মা জোবেদা খাতুনের পাঁচ ছেলে দুইমেয়ের মধ্যে চান্দু ছিলেন তৃতীয় সন্তান।

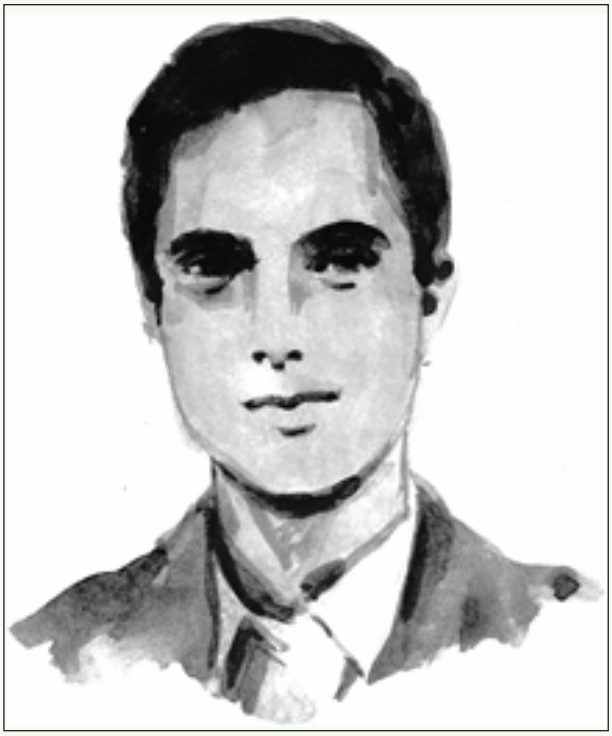

আব্দুল খালেক খান ছিলেন বগুড়া ফায়ার স্টেশনে লিডার পদে অধিষ্ঠিত। বগুড়া ফায়ার স্টেশনের পাশেই তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন ভাড়া বাসায়। এই সুবাদে চান্দু আসা-যাওয়া করতেন বগুড়া ফায়ার স্টেশনে। ফলে ফায়ার ফাইটার পরিবারের সদস্য হিসেবে ফায়ারকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি যখন বগুড়া মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্র তখন গঠন করেন 'বগুড়া ফায়ার সার্ভিস ফুটবল টিম'। চান্দু ছিলেন একজন চৌকস ফুটবলার এবং ক্রীড়া সংগঠক। তিনি ফায়ার সার্ভিস ফুটবল ও ভলিবল খেলায় পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। খেলাধুলার কারণে যাতে লেখাপড়ায় সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতেন তার বাবা।

চান্দু তার প্রথম জীবনে খেলাধুলা শুরু করেন বগুড়া ফায়ার স্টেশনে। তিনি সুনিপুণ কৌশলে বল নিয়ে প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের দিকে এগুতেই দর্শকের করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠত খেলার মাঠ। চান্দু ছিলেন দীর্ঘদেহের বলিষ্ঠ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি ব্যাঘ্রের মতো ক্ষিপ্রতায় নির্ভয়চিত্তে বল নিয়ে নানান ভঙ্গিমায় এগিয়ে যেতেন মাঠের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ক্রীড়ামোদীরা চান্দুর খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। খেলায় পারদর্শিতার জন্য তিনি বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে লাভ করেন ফুটবল একাদশের সদস্যপদ। ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বগুড়া একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খেলায় চ্যাম্পিয়ন অর্জনে চান্দু ছিলেন অন্যতম।

মাসুদুল আলম খান চান্দু একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে যেমন পরিচিত ছিলেন তেমনি একজন নাগরিক হিসেবে রাজনীতি সচেতন ছিলেন। একাত্তরের মার্চের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর ১৭/১৮ জন সৈনিক এসে বগুড়া ফায়ার স্টেশনে ক্যাম্প করে। সেই সাথে পার্শ্ববর্তী এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট স্থাপন করে ফায়ার টাওয়ারে। এসব নিয়ে চান্দুর সঙ্গে বিমান বাহিনীর প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে হাতাহাতি বাঁধে। এরপর তিনি বগুড়ার এমপি মাহমুদুল হাসান, বগুড়া জেলার ন্যাপ সভাপতি মোশাররফ হোসেন মণ্ডল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে আসেন বগুড়া ফায়ার স্টেশনে। তারা বগুড়া ফায়ার স্টেশনে এসে বিমান বাহিনীর স্থাপিত স্যাটেলাইটটি দেখতে পায়। এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমগ্র বগুড়া শহর পর্যবেক্ষণ করার ফন্দি এঁটেছে তা বুঝতে পারেন নেতৃবৃন্দ। বগুড়া শহরের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিমানবাহিনীর সৈনিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। প্রচণ্ড চাপের মুখে বিমানবাহিনীর সৈনিকরা বগুড়া ফায়ার স্টেশন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর বিমানবাহিনীর সৈনিকরা অবস্থান করে বগুড়া পলিটেকনিক অফিসে।

এই অসহযোগ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে চলে আসে পঁচিশ মার্চের ভয়াল কালো রাত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বগুড়া শহরের দিকে রওয়ানা হয়। এ সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা ও বগুড়া ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সম্মিলিতভাবে গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। অপরদিকে মাসুদুল আলম চান্দুর নেতৃত্বে রেলের বগি দিয়ে ব্যারিকেড দেয় রেলক্রসিংয়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বগুড়া শহরে ঢুকতেই সর্বপ্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় রেলক্রসিং ব্যারিকেডে। হানাদার বাহিনী পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে থাকে সংগ্রামী ছাত্র-জনতার ওপর। সংগ্রামী ছাত্র-জনতা জীবনবাজি রেখে মোকাবিলা করতে থাকে হানাদার বাহিনীকে। হানাদার বাহিনী ব্যারিকেড ভাঙতে না পেরে অবস্থান নেয় সরকারি মহিলা কলেজের ভেতরে। সেখানেও সংগ্রামী ছাত্র-জনতা মরণভয় উপেক্ষা করে ঘেরাও করে রাখে হানাদার বাহিনীকে।

২৬শে মার্চ। হানাদার বাহিনী মজিবর রহমান মহিলা কলেজ থেকে বগুড়া ফায়ার স্টেশনের টাওয়ার লক্ষ্য করে শেলিং ছুঁড়ে। শেলিং লক্ষ্যচ্যুত হয়ে দক্ষিণ বগুড়ার কবরস্থানের (বর্তমান ভাই পাগলার মাজার) একটি প্রকাণ্ড আম গাছে এসে পড়ে। তখনও ফায়ারকর্মী ও সংগ্রামী ছাত্র-জনতা অবস্থান করছিল বগুড়া ফায়ার স্টেশনে। পাকিস্তানি বাহিনী ১০/১২ দিন অবরুদ্ধ থাকার ফলে রংপুর ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খাদ্যসামগ্রী ফুরিয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে পালিয়ে যায় হানাদার বাহিনী।

মাসুদুল আলম খান চান্দুর নেতৃত্বে সংগ্রামী ছাত্র-জনতা ও ফায়ার ফাইটাররা ব্যারিকেড সৃষ্টি করে অবতীর্ণ হয় প্রতিরোধযুদ্ধে। এর ফলে বগুড়া শহর থেকে হানাদার বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু বগুড়া শহর দখলে নিতে তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করে। ২৫শে এপ্রিল বিমান বাহিনী আকাশপথে এবং পদাতিক বাহিনী সান্তাহার, পাবনা ও রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মার্চ করে তিন দিক থেকে বগুড়া শহর আক্রমণ করে। এই ত্রিমুখী আক্রমণের ফলে ছাত্র-জনতা ও অগ্নিসেনারা টিকতে না পেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এরই এক পর্যায় ফায়ারম্যান আব্দুল মান্নান ধরা পড়ে বিহারিদের হাতে। নির্মমভাবে হত্যা করে তাকে রেল লাইনের পাশে।

শৈশব থেকেই মাসুদুল আলম খান চান্দু ছিলেন স্বাধীনচেতা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিতে চান্দু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যান ভারতে। ভারতের শিলিগুঁড়ি পানিঘাটা ক্যাম্পে গ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ। তার প্রশিক্ষক ছিলেন মেজর চক্রবর্তী। এই পানিঘাটা ক্যাম্পে একেক গ্রুপে দুশোজন মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চান্দু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন চার্লি গ্রুপে। চান্দু ছিলেন দীর্ঘদেহ, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। সেই সাথে সাহসিকতা, মনোবল সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধিকারী। যোগ্যতা আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতায় পঞ্চাশজন মুক্তিযোদ্ধার কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে মনোনীত করা হয় চান্দুকে।

পশ্চিম দিনাজপুরের কালিগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় ছিল সাত নম্বর সেক্টরের কার্যালয়। সাত নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কর্নেল নূরুজ্জামান। সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ৯২ নম্বর গেরিলা কমান্ডার চান্দু তার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স্বদেশে ফেরার জন্য রওয়ানা হন। চান্দুর কোম্পানির সেকেন্ড-ইন-কমান্ডার ছিলেন মোতাকবির আঞ্জু। আসামের দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে মাইনকার চর হয়ে পা রাখেন নিজ মাতৃভূমির ভূখণ্ডে। তারপর নৌকাযোগে যমুনা নদীর উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে চলে আসেন ফুলছড়ির ঘাটে। ফুলছড়ির ঘাটে এসেই যুদ্ধ শুরু হয় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। এই সম্মুখযুদ্ধে কৌশলগত অবস্থানে থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে যান চান্দাইকোনা এলাকায়।

মাসুদুল আলম খান চান্দু তার গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অবস্থান করেন বগুড়া জেলার পূর্বাঞ্চলে। এখান থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের গতিবিধি। জুলাই মাসের আট তারিখে জানতে পারেন যে, রাজাকার কমান্ডার বাঘাবাড়ি থেকে দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে ধরে নিয়ে গাবতলি দাড়িপাড়া নিজের বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে। যে কোনো সময় এই দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে তুলে দিতে পারে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে। এ খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধার করতে চান্দুর নেতৃত্বে রাত ৪টার দিকে রাজাকার কমান্ডারের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। রাজাকার কমান্ডার বুঝতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধারা তার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করতে গুলি ছুঁড়তে থাকে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুতে থাকে। এক পর্যায় রাজাকার কমান্ডার গোলাগুলি বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। রাজাকার কমান্ডারের গুলি ফুরিয়ে গেছে একথা ভেবে চান্দু হামাগুড়ি দিয়ে রাজাকারের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েন। তারপর বন্দিরত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন চান্দু। এমন সময় রাজাকারের একটি গুলি এসে চান্দুর বুকে লাগে। গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন চান্দু। এরপর এই অপারেশনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডার মুতাকবির হোসেন আঞ্জুর নেতৃত্বে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গাবতলি দাড়িপাড়া ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায় রাজাকার কমান্ডার।

এই সুযোগে বন্দিরত মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে মুক্তিযোদ্ধারা। মুতাকবির হোসেন আঞ্জু আর জাহিদ হোসেন চান্দুর রক্তাক্ত মৃতদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে আসে। প্রায় দুই মাইল পথ হেঁটে বাঙালি নদীর পাড়ে এসে নৌকায় লাশ তুলে রাখা হয়। তার পরদিন চান্দুর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় রৌহাদহ গ্রামে। চান্দুর শহিদ হবার খবর পেয়ে ছুটে আসেন মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী। চান্দুর লাশ ঘিরে মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের কান্নায় এক বেদনাবিধুর আবহ সৃষ্টি হয়।

একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে খেলার মাঠে চান্দু ছিলেন দুর্জয়-দুর্বার। তেমনিভাবে দেশমাতৃকাকে শত্রুবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে হয়ে উঠেছিলেন দুরন্ত-দুর্ধর্ষ। সহযোদ্ধার জীবন বাঁচাতে গিয়ে উৎসর্গ করেন নিজের সোনালি জীবন। গ্রিক বীর হারকিউলিস যেমন হেফেটাসগিরি শৃঙ্গের থেকে শৃঙ্খল ভেঙে উদ্ধার করেছিলেন বন্দি প্রমিউথিউসকে, তেমনিভাবে রাজাকারের বন্দি শৃঙ্খল থেকে সহযোদ্ধাদের মুক্ত করতে বিলিয়ে দিলেন নিজের যৌবনদীপ্ত জীবনখানি। স্বাধীনতার পর বগুড়া শহরের স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয় এই অকুতোভয় বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা চান্দুর নামে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মাসুদুল আলম খান চান্দুর বীরগাথা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে অনন্তকাল।

মিয়াজান কবীর: লেখক ও গবেষক, miajankabir@gmail.com

ডাকটিকিটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ড. মোহাম্মদ আলী খান

১৯৭১। রক্তেরাঙা একাত্তর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, লাল-সবুজ পতাকা যে-কোনো বাঙালির হৃদয়ে আলোড়ন তোলে গভীর মমতায়। বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটের বর্ণিল অবয়বেও সেই গর্বিত স্মৃতি হয়ে উঠেছে অক্ষয় অব্যয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার ২৯শে জুলাই ১৯৭১ সালে প্রথম আটটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিভিন্ন বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ডাকটিকিট প্রকাশের ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ এম.পি. মিস্টার জন স্টোনহাউস। আর আটটি ডাকটিকিটের নকশাকার ছিলেন মি. বিমান মল্লিক (জন্ম: ১৭.১২.১৯৩৩, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ)। বিমান মল্লিকের ভাষায়:

> 'একাত্তরের ২৯ এপ্রিল সাবেক ব্রিটিশ ডাক যোগাযোগ মন্ত্রী জন স্টোনহাউস আমার বাসায় ফোন করে আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমাকে খুবই জরুরী প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর ডাকটিকিটের নকশা করতে গিয়ে পরিচয়। সেই সন্ধ্যায় আলাপ হয় স্টোনহাউসের সঙ্গে। বললেন বাংলাদেশের ডাকটিকিট করে দিতে হবে, হাতে সময় কম।' (*প্রথম আলো*, ছুটির দিনে, ২৮শে জুলাই ২০১২)।

হাউস অব কমন্সে আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলনে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ২৬শে জুলাই ১৯৭১ তারিখে আটটি ডাকটিকিটের সেট ও ফার্স্ট ডে কভার প্রদর্শন করেন। আটটি ডাকটিকিটের সেটের বিক্রয়মূল্য ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে এক পাউন্ড নয় পেনি। আর মুক্তাঞ্চলে বাংলাদেশ সরকার তা প্রকাশ করেন ২৯শে জুলাই ১৯৭১ সালে। ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ রুপি, ২ রুপি, ৩ রুপি, ৫ রুপি ও ১০ রুপি মূল্যমানের ৮টি ডাকটিকিট জাতিছাপা হয় লিথোগ্রাফ প্রসেসে, ব্রিটেনের ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে। চার রঙের এই ডাকটিকিটগুলোর চারদিকের মাপ ছিল ৩৯×১২.৫ মিমি, আর পারফোরেশন ছিল ১৪×১৪.৫ মাইক্রন। প্রথম প্রকাশিত আটটি ডাকটিকিটের কয়েকটি নিম্নরূপ:

উল্লেখ্য, তখন টাকার সিম্বল '৳' ব্যবহার শুরু হয়নি, ডাকটিকিটে তাই রুপি লেখা হয়, এছাড়া ইংরেজি ও বাংলায়, বাংলাদেশ, দুটি শব্দে লেখা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীন হবার পর ঐ ৮টি ডাকটিকিটের মধ্য থেকে তিনটি ডাকটিকিটের উপর 'বাংলাদেশের মুক্তি' 'Bangladesh Liberated', বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ওভারপ্রিন্ট (overprint) করা হয় এবং এগুলো বিক্রি শুরু হয় ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকা জিপিও থেকে। পরবর্তী সময়ে ডাকটিকিট দিবস ২০০৮ পালনের লক্ষ্যে ২৯শে জুলাই ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস উক্ত ঐতিহাসিক ৮টি ডাকটিকিট নিয়ে একটি স্যুভেনির শিট প্রকাশ করে, মূল্যমান ছিল ৫০ টাকা, নকশাবিদ ছিলেন জসিম উদ্দীন। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ সীলমোহর ব্যবহৃত হয় ও একটি উদ্বোধনী খামও প্রকাশিত হয়।

উল্লিখিত প্রথম ডাকটিকিটের সিরিজের পর ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ মুক্তিযুদ্ধের ওপর বেশ কয়েকটি বর্ণিল স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেছে।

১৯৭২ সালের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিটে মুদ্রিত হয়েছে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি বা মশাল, যার ডিজাইনার ছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ড। এ সময় মোট ৩টি স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়। এর ভিতর ২০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটের রং ছিল বাদামি ও লাল, ৬০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটের রং নীল ও লাল এবং ৭৫ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটের রং ছিল ভায়োলেট ও লাল। মুদ্রণে ছিল ইন্ডিয়ান সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস। স্মারক ডাকটিকিটগুলোর আকার ছিল ৩৯.১×২৯ মিমি।

প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম, ২৬.০৩.১৯৭২

প্রথম বিজয় দিবসে (১৬.১২.১৯৭২) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০ পয়সা, ৬০ পয়সা ও ৭৫ পয়সা মূল্যের তিনটি স্মারক ডাকটিকিট

প্রকাশ করে। মুক্ত আকাশে উড়ছে মুক্ত পায়রা। মোট ৬টি পায়রা উড়ছে এমন নকশা সমৃদ্ধ ডাকটিকিটটির নকশাবিদ ছিলেন কে. জি. মোস্তফা এবং মুদ্রণে ছিল যুক্তরাজ্যের ব্রাডবেরি উইলকিনসন অ্যান্ড কোং লিমিটেড। স্মারক ডাকটিকিটগুলোর ছিদ্রক দূরত্ব ছিল ১৩.৫ মাইক্রন, আকার ৪০×২৮.৫ মিমি।

১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করে চমৎকার তিনটি স্মারক ডাকটিকিট। এর মূল্যমান ছিল ২০ পয়সা, ৬০ পয়সা এবং এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা। নকশাবিদ ছিলেন কে. জি. মোস্তফা। ডাকটিকিটের ওপরের অংশে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা 'মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে', নীচে জমিনে ভাঙাখুলির মাঝ থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছে সাদা রঙের একটি সতেজ ফুল। চমৎকার এই নকশা-কল্পনা। যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত ডাকটিকিটগুলোর পারফোরেশন বা ছিদ্রক দূরত্ব ১৩.৫ মাইক্রন এবং আকার ৪০×২৮.৫ মিমি।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরাট অর্জন। এ উপলক্ষে দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়, সঙ্গে একটি চমৎকার উদ্বোধনী খাম ও বিশেষ সীলমোহর অবমুক্ত করা হয়। প্রকাশকাল: ২৫.০৯.১৯৭৪, ডাকটিকিটের আয়তন ৪২×২৮.৫ মিমি, পারফোরেশন ১৩.২×১৩.২, মূল্যমান (Denomination) ২৫ পয়সা ও এক টাকা। লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে যুক্তরাজ্যের মেসার্স ব্রাডবারি উইলকিন্সন অ্যান্ড কোং লিমিটেড থেকে মুদ্রিত। নকশাবিদ ছিলেন আহমেদ এফ, করিম।

'জাতিসংঘে বাংলাদেশ' উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম, ২৫.০৯.১৯৭৪

স্বাধীনতার দশম বার্ষিকী পালনের লক্ষ্যে ২৬শে মার্চ ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ দুটি স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করে। মূল্যমান ৫০ পয়সা ও দুই টাকা। ৫০ পয়সার ডাকটিকিটে শোভা পাচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধা, এক হাতে বাংলাদেশের পতাকা, অন্য হাতে স্টেনগান, পিছনে রক্তিম সূর্য। আর ২ টাকা মূল্যমানের ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র। এ ডাকটিকিটের নকশাবিদ ছিলেন প্রাণেশ কুমার মণ্ডল এবং মুদ্রিত হয়েছে অস্ট্রিয়ার ব্রুডার রোসেনবাম থেকে। পরবর্তী সময়ে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে ২১.১১.১৯৮২ সালে ৬০ পয়সা মূল্যমানের ডাকটিকিটের উপর ওভারপ্রিন্ট করে তা অবমুক্ত করা হয়। স্মারক ডাকটিকিটগুলোর আকার ছিল ৪২×৩২ মিমি।

সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ স্মরণে স্মারক ডাকটিকিটের উদ্বোধনী খাম, ১৬.১২.১৯৮২

২৬শে মার্চ ১৯৯১ সালে স্বাধীনতার ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ৫টি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তারিখ: ২৬.৩.১৯৯১। প্রতিটি স্মারক ডাকটিকিটের মূল্যমান ৪ টাকা। এতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ৫টি স্মৃতিসৌধ ও ভাস্কর্যের ছবি শোভা পাচ্ছে। এগুলো হলো অপরাজেয় বাংলা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে), মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য (জয়দেবপুর চৌরাস্তা), মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ (মেহেরপুর), শিখা অনির্বাণ (ঢাকা সেনানিবাস) এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ (সাভার)। স্মারক ডাকটিকিটগুলোর প্রতিটির আকার ৩৬×৩৬ মিমি, নকশাবিদ ছিলেন মাহবুব আকন্দ। গাজীপুরস্থ সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন লিমিটেড থেকে তা মুদ্রণ করা হয়েছে।

বিজয় দিবসের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করে দুটি স্মারক ডাকটিকিট। মূল্যমান ৪ টাকা ও ৬ টাকা। ৪ টাকা মূল্যমানের টিকিটে শোভা পাচ্ছে জনগণের বিজয় মিছিল, ৬ টাকা মূল্যমানের টিকিটে শোভা পাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের অপরাজেয় বাংলা, সামনে অস্ত্রহাতে বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা। স্মারক ডাকটিকিট দুটির নকশাবিদ ছিলেন মো. শামসুজ্জোহা।

১৯৯৬ সালে স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকী (১৯৭১-১৯৯৬) উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করেছে ৬টি স্মারক ডাকটিকিট। প্রতিটির মূল্যমান ৪ টাকা এবং আকার ৩২×৪৮ মিমি। নকশাবিদ ছিলেন মোজাম্মেল হক, আনোয়ার হোসেন, মোঃ শামসুজ্জোহা ও মতিউর রহমান। ৬টির ভেতর একটি ডাকটিকিটে শোভা পাচ্ছে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও মুক্তিযোদ্ধার হাতে স্টেনগানের মাথায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, অপর একটিতে শোভা পাচ্ছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। বাকি ৪টিতে রয়েছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার বিভিন্ন ছবি।

২০০৪ সালে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হয় ৫ টাকা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট, নকশাবিদ ছিলেন মৃনাল চক্রবর্তী। ২০০৫ সালে প্রকাশিত ১০ টাকা মূল্যের স্মারক ডাকটিকিটের নকশাবিদ ছিলেন আমিরুল ইসলাম সিকদার। অনুরূপভাবে ২০০৬ সালেও এ মহান দিবস স্মরণে ১০ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ। ২০০৮ সালের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১০ টাকা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ। এতে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা,

মুক্তিযোদ্ধার বিজয় উল্লাস। নকশাবিদ ছিলেন কে. জি. মোস্তফা। ডাকটিকিটটির ছিদ্রক দূরত্ব (Perforation) ১২.৫ মাইক্রন, আকার ৪২×৩২ মিমি।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১০ উপলক্ষে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস প্রকাশ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য সিরিজ। প্রকাশিত হয় মোট ৪টি স্মারক ডাকটিকিট যার প্রতিটির মূল্যমান ৫ টাকা। এ চারটি স্মারক ডাকটিকিটে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্মারক স্মৃতিসৌধ, যেমন: মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্মৃতিসৌধ-পাবলিক লাইব্রেরি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্মৃতিসৌধ-সফিপুর, গাজীপুর; মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্মৃতিসৌধ-জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক স্মৃতিসৌধ-ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ, রংপুর।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য সিরিজ, ২৬.০৩.২০১০

মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করতে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন, পণ্ডিত রবিশংকর প্রমুখ ১লা আগস্ট ১৯৭১ তারিখে নিউইয়র্কের ম্যাডিসিন স্কোয়ারগার্ডে আয়োজন করেন 'The Concert For Bangladesh'। তার স্মরণে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করে একটি আকর্ষণীয় স্যুভেনির শিট। এই শিটের মাঝে ঐদিনের অনুষ্ঠানের ছবি প্রকাশ পাচ্ছে। স্মারক ডাকটিকিটটির ছিদ্রক দূরত্ব ১২.৫ মাইক্রন। নকশাবিদ ছিলেন কে. জি. মোস্তফা। মূল্যমান ৬০ টাকা, প্রকাশকাল: ২০১৫।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবনদানকারী বুদ্ধিজীবীদের অবদানের কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁদের স্মরণে ১৯৯১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করেছে নয়টি পর্যায়ে মিলে ১৫২টি স্মারক ডাকটিকিট। প্রত্যেক ডাকটিকিটে শহিদ বুদ্ধিজীবীর প্রতিকৃতি ও নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে) শোভা পাচ্ছে।

স্মারক ডাকটিকিটগুলোর আকার ৩২×৪২ মিমি, ছিদ্রক দূরত্ব ১৩৩/৪ মাইক্রন। সাদা-কালো রঙে ছাপা প্রতিটি ডাকটিকিটের মূল্যমান ২ টাকা। প্রতিটি শিটে, দুই সারি স্মারক ডাকটিকিটের মাঝে উদ্ধৃতি রয়েছে কবিগুরুর কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি (বাংলা ও ইংরেজিতে)।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে স্মারক ডাকটিকিটগুলো একে একে প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯১ সালে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ৩০ জন বুদ্ধিজীবীর ওপর। এরপর ১৯৯৩ সালে ১০ জন, ১৯৯৪ সালে ১৬ জন, ১৯৯৫ সালে ১৬ জন, ১৯৯৬ সালে ১৬ জন, ১৯৯৭ সালে ১৬ জন, ১৯৯৮ সালে ১৬ জন, ১৯৯৯ সালে ১৬ জন এবং নবম পর্যায়ে ২০০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় ১৬ জন। এগুলো শহিদ বুদ্ধিজীবী সিরিজ নামে সুপরিচিত।

সবগুলো স্মারক ডাকটিকিট মিনি শিটে মুদ্রণ করা হয়েছে। দেশের এই কৃতি সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছে স্মারক ডাকটিকিটের মাধ্যমে।

বাম থেকে ডানে ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এ.এন.এম. মুনীরুজ্জামান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. আবদুল আলীম চৌধুরী, সিরাজুদ্দীন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলতাফ মাহমুদ, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ডা. মো. আবুল খায়ের, ডা. সিরাজুল হক খান।

বিজয় দিবসের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ২০০১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রকাশ করে প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যমানের ৪টি স্মারক ডাকটিকিট। এর নকশাকার ছিলেন মাহবুব আকন্দ। বহুরঙা এই স্মারক ডাকটিকিটে শোভা পাচ্ছে 'মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ৩০ বছর' লেখা, জলছাপে ১৯৭১ ও ২০০১ সাল এবং মুক্তিযুদ্ধের চারটি পদকের ছবি: বীর বিক্রম, বীর প্রতীক, বীরশ্রেষ্ঠ ও বীর উত্তম। ডাকটিকিটগুলোর আকার প্রতিটি ৪২×৩২ মিমি।

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৯, ১লা পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেছে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও একটি উদ্বোধনী খাম। ডাকটিকিটের মূল্যমান ১০ টাকা, আকার ৩২ মিমি × ৪৮ মিমি, ছিদ্রক দূরত্ব (perforation) ১২.৫ মাইক্রন। বহু রং বিশিষ্ট এই চমৎকার ডাকটিকিটের নকশা করেছেন সন্‌জীব কান্তি দাস আর মুদ্রাকর দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি., গাজীপুর।

এই স্মারক ডাকটিকিটে চিত্রিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পতাকা এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধের

ওপরে ৫টি উড়ন্ত পায়রা। এ ভেতর ৪টি পায়রার রং রক্তাভ-লাল এবং একটির রং সাদা। ৪টি রক্তাক্ত পায়রা, রক্তের দামে কেনা মহান বিজয়কে প্রতীকায়িত করছে এবং উড়ন্ত সাদা পায়রাটি বিজয়ের পর শান্তিকে প্রকাশ করছে। একই নকশায় তৈরি উদ্বোধনী খামটিও (First Day Cover-FDC) চমৎকার। স্মারক ডাকটিকিটের নীচের অংশে লেখা মহান বিজয় দিবস-২০১৯ এবং ইংরেজিতে লেখা 'National Victory Day-2019'; এখানে 'মহান'-এর ইংরেজি অনুবাদ অনুপস্থিত।

রক্তভেজা একাত্তরকে বারে বারে মনে করার মাঝে আমাদের হৃদয়ের উঠোন ভিজে যায় চোখের জলে। একাত্তরের স্মৃতি, নির্যাতন, গণহত্যার দৃশ্যপট চিত্রিত হয়েছে বাংলাদেশ ডাকবিভাগের কয়েকটি অসাধারণ স্মারক ডাকটিকিটে। মহান একাত্তর স্মরণে মোট ৭১টি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালে। মিনি স্যুভেনির শিট ১৮টি। প্রত্যেকটিতে ৪টি করে এবং একটিতে ৩টি স্মারক ডাকটিকিট। মোট ৭১টি। প্রতিটি স্মারক ডাকটিকিটের মূল্যমান ১০ টাকা। আর প্রতিটি মিনি স্যুভেনির শিটের মূল্যমান ৪০ টাকা। প্রকাশের তারিখ: ৫ই জুন ২০১৭। প্রতিটি স্মারক ডাকটিকিটের আকার ৩১ মিমি × ৪৮ মিমি, ছিদ্রক দূরত্ব ১২.৫ মাইক্রন। ছিদ্রবিহীন স্যুভেনিরের আকার ১৭০ মিমি × ১১০ মিমি। নকশাবিদ ছিলেন সনজীব কান্তি দাস, আনোয়ার হোসেন ও বনি আদম। মুদ্রিত হয়েছে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি., গাজীপুর থেকে। এই স্মারক ডাকটিকিটে কোন রং লাগেনি, শুধু সাদা-কালো ছবি চিত্রিত হয়েছে নিপুণ ভঙ্গিমায় আর বেদনাঘন আবহে।

সেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের যুদ্ধাপরাধ-এর উপর 'বাংলাদেশে গণহত্যা-নির্যাতন ১৯৭১' শীর্ষক স্যুভেনির শিট ও স্মারক ডাকটিকিট ইতিহাসের দুঃখজনক অধ্যায়কে তুলে এনেছে। উঠে এসেছে একাত্তরের ভয়াবহ চিত্র। তারই কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো:

বাংলাদেশের গণহত্যা-নির্যাতন ১৯৭১ শীর্ষক স্যুভেনির শিট, ০৫.০৬.২০১৭

২৬শে মার্চ ২০২০ তারিখে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস ২০২০' উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করেছে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম, ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ

জাতীয় গণহত্যা দিবস ২০২০ উপলক্ষে প্রকাশিত ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম, ২৫.০৩.২০২০

সীলমোহর। অবমুক্তির তারিখ ১১ই চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, ২৫শে মার্চ ২০২০। স্মারক ডাকটিকিটটির মূল্যমান ১০ টাকা এবং এর আকার ৩২ মিমি × ৪৮ মিমি, ছিদ্রক দূরত্ব ১২.৫ মাইক্রন। নকশাবিদ সুমন্ত কুমার। মুদ্রিত হয়েছে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি., গাজীপুর থেকে। স্মারক ডাকটিকিটটিতে চিত্রিত হয়েছে ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এ গণহত্যার এক নির্মম।

তথ্যের উৎস

১. *বাংলাদেশ ডাকবিভাগ, বাংলাদেশ সরকার*

২. *কবিতা গান ও ডাকটিকিটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (২০২০), ড. মোহাম্মদ আলী খান, মুক্তচিন্তা, ঢাকা*

৩. *Postage Stamps of Bangladesh 1971-2002 (2002), Bangladesh Post Office, Dhaka.*

৪. *Postage Stamps of Bangaldesh 2002-2007 (2004), Bangladesh. Post Office, Dhaka.*

৫. *Postage Stamps of Bangladesh 1971-2008 (2007), Siddigue Mahamudar Rahman, Mizan Publishers, Dhaka.*

৬. *Postage Stamps on Liberation of Bangladesh (2013), Muhammad Lutful Haq, Nymphea Publication, Dhaka.*

৭. *Bangladesh Overprints-An Update: Peter Symes, IBNS Journal, Vol. 44, No. 1.*

৮. *Bangladesh Postage Stamp (2017), Bangladesh National Museum, Dhaka.*

৯. *www.bdpost.gov.bd*

ড. মোহাম্মদ আলী খান: লেখক, গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব, khanma1234@gmail.com

মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন (সেক্টর)

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে ভাগ করা হয়। প্রতি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার (অধিনায়ক) নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত হন।

১নং সেক্টর

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হরিনাতে। সেক্টর প্রধান ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান এবং পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: ঋষিমুখ (ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম); শ্রীনগর (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); মনুঘাট (ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); তবলছড়ি (সুবেদার আলী হোসেন); এবং ডিমাগিরী (জনৈক সুবেদার)। এই সেক্টরে প্রায় দশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ই.পি.আর, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রায় দুই হাজার নিয়মিত সৈন্য এবং গণবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। এই বাহিনীর গেরিলাদের ১৩৭টি গ্রুপে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।

২নং সেক্টর

ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের বাহিনী গঠিত হয় ৪-ইস্টবেঙ্গল এবং কুমিল্লা ও নোয়াখালীর ইপিআর বাহিনী নিয়ে। আগরতলার ২০ মাইল দক্ষিণে মেলাঘরে ছিল এ সেক্টরের সদরদপ্তর। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং পরে মেজর এ. টি. এম. হায়দার। এই সেক্টরের অধীনে প্রায় ৩৫ হাজারের মতো গেরিলা যুদ্ধ করেছে। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা (মাহবুব এবং পরে লেফটেন্যান্ট ফারুক ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবীর); মন্দভাব (ক্যাপ্টেন গাফফার); শালদানদী (আবদুস সালেক চৌধুরী); মতিনগর (লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম); নির্ভয়পুর (ক্যাপ্টেন আকবর এবং পরে লেফটেন্যান্ট মাহ্বুব); এবং রাজনগর

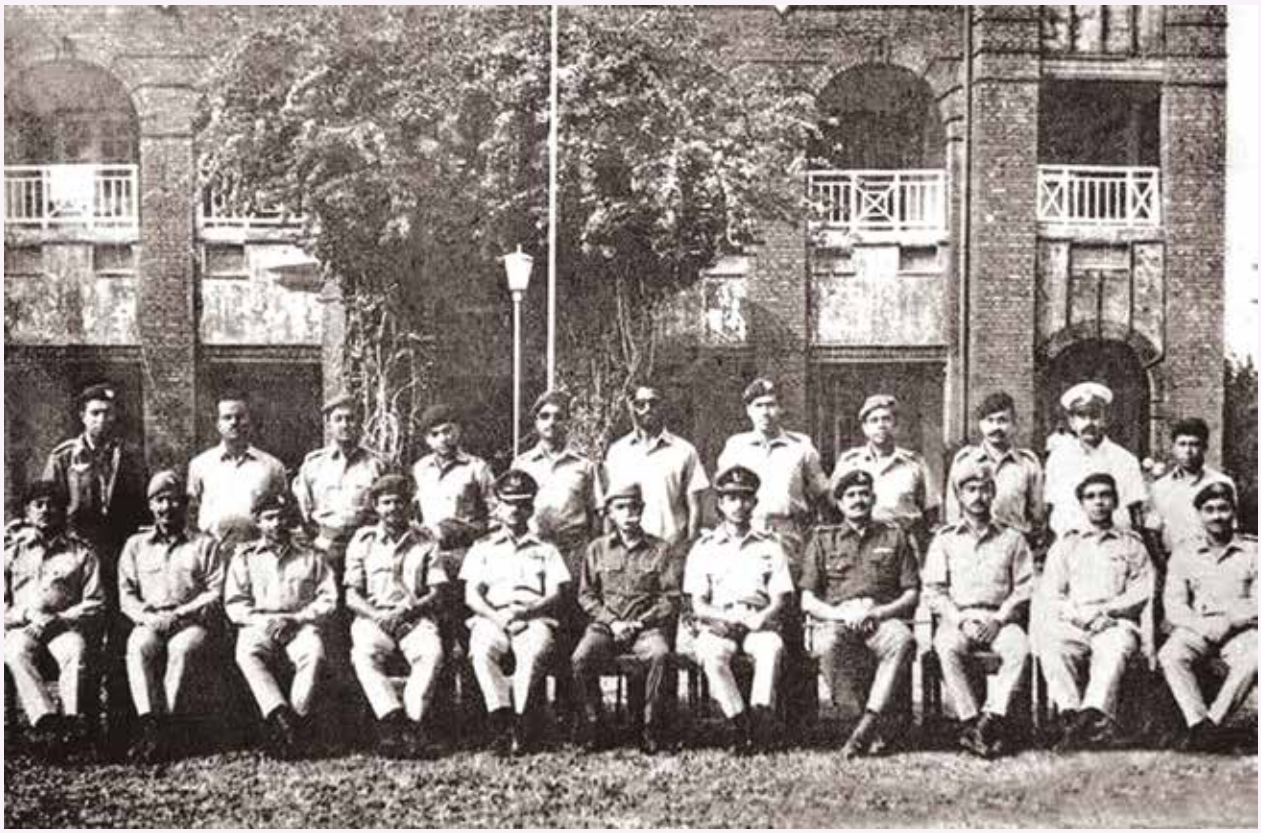

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে সেক্টর কমান্ডাররা

(ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং পরে ক্যাপ্টেন শহীদ ও লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান)। এই সেক্টরের বাহিনীর অভিযানের ফলে কুমিল্লা ও ফেনীর মধ্যবর্তী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে পাকবাহিনী সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিককালে এই এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকারে থাকে। এই সেক্টরের বাহিনীর অভিযানের অন্যতম প্রধান সাফল্য হলো বেলোনিয়া সূচিব্যুহ প্রতিরক্ষা। ১নং ও ২নং সেক্টরের বাহিনীর যৌথ অভিযানের ফলে ২১শে জুন পর্যন্ত বেলোনিয়া সূচিব্যুহের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ২ নম্বর সেক্টরের কয়েকটি নিয়মিত কোম্পানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনা করে। এই কোম্পানিগুলো ছিল সুবেদার লুৎফর রহমানের অধীনে বেগমগঞ্জ এলাকায় অভিযানরত নোয়াখালী কোম্পানি, সুবেদার জহিরুল আলম খানের অধীনে চাঁদপুর মতলব এলাকায় অভিযানরত চাঁদপুর কোম্পানি, ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর অধীনে ঢাকার মানিকগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জ এলাকায় অভিযানরত এক বিশাল বাহিনী, এবং ক্যাপ্টেন শওকতের অধীনে ফরিদপুরে অভিযানরত এক বাহিনী। শহরাঞ্চলের গেরিলারা ঢাকা শহরে কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করে।

৩নং সেক্টর

উত্তরে চূড়ামনকাঠি (শ্রীমঙ্গলের নিকট) থেকে সিলেট এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে. এম শফিউল্লাহ এবং পরে মেজর এ. এন. এম. নূরুজ্জামান। দুই ইস্ট বেঙ্গল এবং সিলেট ও ময়মনসিংহের ইপিআর বাহিনী সমন্বয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টরের সদর দপ্তর ছিল হেজামারা। এই সেক্টরের অধীনে ১৯টি গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। নভেম্বর মাস পর্যন্ত গেরিলার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা কুমিল্লা-সিলেট সড়কে কয়েকটি সেতু বিধ্বস্ত করে পাকবাহিনীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাদের সবচেয়ে সফল আক্রমণ ছিল শায়েস্তাগঞ্জের নিকটে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইনের সাহায্যে একটি রেলগাড়ি বিধ্বস্ত করা। এই সেক্টরের দশটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: আশ্রমবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); বাঘাইবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); হাতকাটা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান); সিমলা (ক্যাপ্টেন মতিন); পঞ্চবটী (ক্যাপ্টেন নাসিম); মনতলা (ক্যাপ্টেন এম. এস. এ. ভূঁইয়া); বিজয়নগর (এম. এস. এ. ভূঁইয়া); কালাছড়া (লেফটেন্যান্ট মজুমদার); কলকলিয়া (লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোরশেদ); এবং বামুটিয়া (লেফটেন্যান্ট সাঈদ)।

৪নং সেক্টর

উত্তরে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট থানা পর্যন্ত ১০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। সিলেটের ইপিআর বাহিনীর সৈন্যদের সঙ্গে ছাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং পরে ক্যাপ্টেন এ রব। হেডকোয়ার্টার ছিল প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে আসামের মাসিমপুরে। সেক্টরে গেরিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ হাজার এবং নিয়মিত বাহিনী ছিল প্রায় ৪ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: জালালপুর (মাসুদুর রব শাদী); বড়পুঞ্জী (ক্যাপ্টেন এ. রব); আমলাসিদ (লেফটেন্যান্ট জহির); কুকিতল (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের এবং পরে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক); কৈলাশ শহর (লেফটেন্যান্ট উয়াকিউজ্জামান); এবং কমলপুর (ক্যাপ্টেন এনাম)।

৫নং সেক্টর

সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকি (তামাবিল) এবং জেলার পূর্বসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। হেড কোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে। আটশো নিয়মিত সৈন্য এবং পাঁচ হাজার গেরিলা সৈন্য সমন্বয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সুনামগঞ্জ ও ছাতকের অধিকাংশ জলাভূমি ছিল এই সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: মুক্তাপুর (সুবেদার নাজির হোসেন এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ফারুক); ডাউকি (সুবেদার মেজর বি. আর. চৌধুরী); শেলা (ক্যাপ্টেন হেলাল; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাহবুবর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ); ভোলাগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট তাহেরউদ্দিন আখুঞ্জী; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এস. এম. খালেদ); বালাট (সুবেদার গনি এবং পরে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও এনামুল হক চৌধুরী); এবং বড়ছড়া (ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিন)। এই সেক্টরের বাহিনী সিলেট, তামাবিল ও সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে বেশ কিছুসংখ্যক সেতু বিধ্বস্ত করে। এই সেক্টরের সর্বাধিক সফল অপারেশন ছিল ছাতক আক্রমণ।

৬নং সেক্টর

সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে গঠিত। প্রধানত রংপুর ও দিনাজপুরের ইপিআর বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার। সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকটবর্তী বুড়িমারীতে। এটিই ছিল একমাত্র সেক্টর যার হেড কোয়ার্টার ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০০ এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১১ হাজার। এদের মধ্যে ছিল ২০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৯০০০ গণবাহিনী। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: ভজনপুর (ক্যাপ্টেন নজরুল এবং পরে স্কোয়াড্রন লিডার সদরউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার); পাটগ্রাম (প্রথমে কয়েকজন ইপিআর জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার কমান্ড করেন। পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এই সাব-সেক্টরের দায়িত্ব নেন); সাহেবগঞ্জ

(ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন); মোগলহাট (ক্যাপ্টেন দেলওয়ার); এবং চিলাহাটি (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল)। এই সেক্টরের বাহিনী রংপুর জেলার উত্তরাংশ নিজেদের দখলে রাখে।

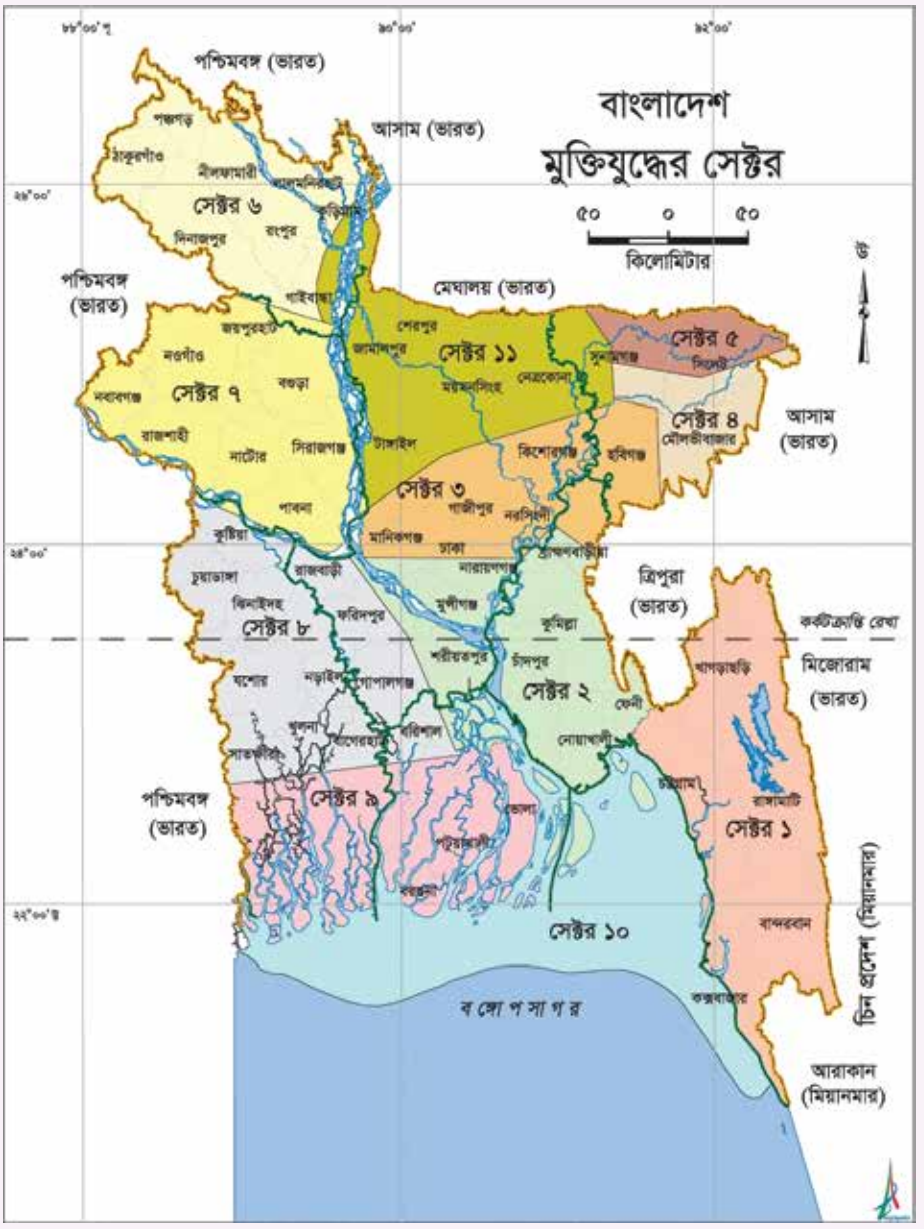

৭নং সেক্টর

রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ নিয়ে গঠিত হয়। ইপিআর সৈন্যদের নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই বাহিনী ক্যাপ্টেন গিয়াস ও ক্যাপ্টেন রশিদের নেতৃত্বে রাজশাহীতে প্রাথমিক অভিযান পরিচালনা করে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক এবং পরে সুবেদার মেজর এ. রব ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল বালুরঘাটের নিকটবর্তী তরঙ্গপুরে। ২৫০০ নিয়মিত সৈন্য ও ১২৫০০ গেরিলা সৈন্য সমন্বয়ে প্রায় ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এই সেক্টরে যুদ্ধ করে। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: মালন (প্রথমে কয়েকজন জুনিয়র অফিসার এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর); তপন (মেজর নজমুল হক এবং পরে কয়েকজন জুনিয়র ইপিআর অফিসার); মেহেদীপুর (সুবেদার ইলিয়াস এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর); হামজাপুর (ক্যাপ্টেন ইদ্রিস); আঙ্গিনাবাদ (একজন গণবাহিনীর সদস্য); শেখপাড়া (ক্যাপ্টেন রশীদ); ঠোকরাবাড়ি (সুবেদার মোয়াজ্জেম); এবং লালগোলা (ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী)। এই সেক্টরের বাহিনী জুন মাসে মহেশকান্দা ও পরাগপুর এবং আগস্ট মাসে মোহনপুর থানা আক্রমণ করে বিপুল সংখ্যক শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে। হামজাপুর সাব-সেক্টরের কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস তাঁর বাহিনী নিয়ে কয়েকটি পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান এবং পার্বতীপুরের নিকটে একটি ট্রেন বিধ্বস্ত করেন।

৮নং সেক্টর

এপ্রিল মাসে এই সেক্টরের অপারেশনাল এলাকা ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা। মে মাসের শেষে অপারেশন এলাকা সংকুচিত করে কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলা, সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ নিয়ে এই সেক্টর পুনর্গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম. এ. মঞ্জুর। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল কল্যানীতে। সেক্টরের সৈন্যদের মধ্যে ৩০০০ ছিল নিয়মিত বাহিনী এবং ২৫০০০ গেরিলা সৈন্য। নিয়মিত বাহিনী কয়েকটি এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং গেরিলা বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি ঘাঁটি গড়ে তোলে। এই সেক্টরের সৈন্যরা যুদ্ধে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। নিয়মিত বাহিনী বাংলাদেশের ৭-৮ মাইল অভ্যন্তরভাগে ঢুকে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে পাকবাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনায়

উদ্বুদ্ধ হয়। এই ব্যবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণকারী পাকবাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্য বিধ্বস্ত করে। এই সেক্টরের সাতটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: বয়রা (ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা); হাকিমপুর (ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহ); ভোমরা (ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন); লালবাজার (ক্যাপ্টেন এ. আর. আযম চৌধুরী); বানপুর (ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান); বেনাপোল (ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম এবং পরে ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী); শিকারপুর (ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং পরে লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর)।

৯নং সেক্টর

বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। এই সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ছিল বশিরহাটের নিকটবর্তী টাকিতে। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. এ জলিল এবং পরে মেজর এম. এ মঞ্জুর ও মেজর জয়নাল আবেদীন। এই সেক্টরে প্রায় বিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করে। এই সেক্টরকে টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ ও শমসেরনগর তিনটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এই সেক্টরে নিয়মিত বাহিনীও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করে। ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী বরিশালে অভিযান করে। পটুয়াখালীতে একটি স্থায়ী ঘাটি থেকে ক্যাপ্টেন মেহদী আলী ইমাম আক্রমণ পরিচালনা করেন। লেফটেন্যান্ট জিয়া সুন্দরবন এলাকায় এক বিশাল বাহিনী পরিচালনা করেন। ক্যাপ্টেন হুদা নিয়মিত বাহিনীর এক বিশাল অংশ নিয়ে সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি জুন মাসে শক্রর উকশা সীমান্ত ঘাটি দখল করেন এবং বরাবর তা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে থাকে। এই সেক্টরের বাহিনী দেভাতা ও শ্যামনগর থানা আক্রমণ করে দখল করে নেয়। নৌ-প্রহরার মাধ্যমে বরিশাল-পটুয়াখালীর নদী এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। ডিসেম্বরে মাসে চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বে এই সেক্টরকে ৮নং সেক্টরের সঙ্গে একীভূত করা হয় এবং এর দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর মঞ্জুরের উপর।

১০নং সেক্টর

নৌ-কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই বাহিনী গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর আট জন বাঙালি নৌ-কর্মকর্তা। এঁরা ছিলেন গাজী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ (চিফ পেটি অফিসার), সৈয়দ মোশাররফ হোসেন (পেটি অফিসার), আমিন উল্লাহ শেখ (পেটি অফিসার), আহসান উল্লাহ (এম.ই-১), এ. ডব্লিউ. চৌধুরী (আর.ও-১), বদিউল আলম (এম.ই-১), এ. আর. মিয়া (ই.এন-১) এবং আবেদুর রহমান (স্টুয়ার্ড-১)। এই আটজন বাঙালি নাবিককে ভারতীয় নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় দিল্লির পার্শ্ববর্তী যমুনা নদীতে বিশেষ নৌ-প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর পাকিস্তান নৌবাহিনীর কিছুসংখ্যক নৌ-সেনা এদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। বিভিন্ন সেক্টর থেকে এমন ১৫০ জন ছাত্র ভলান্টিয়ারকে বাছাই করা হয় যারা দক্ষ সাতারু হিসেবে পরিচিত এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য এই ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তাদের বোমা নিক্ষেপ এবং জাহাজ ধ্বংসের জন্য লিম্পেট মাইন ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এদের চারটি দল চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, দাউদকান্দি ও মংলা বন্দরে পাঠানো হয়। এদের দায়িত্ব ছিল উপকূলে নোঙ্গর করা জাহাজ ধ্বংস করা। পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে (১৪ই আগস্ট) এই চারটি দল একযোগে আক্রমণ চালিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংস করে। এ. ডব্লিউ. চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়োজিত দলটি পাকিস্তানি কার্গো জাহাজ এমডি ওহমাজ্দ ও এমভি আল-আববাস সহ সাতটি জাহাজ ধ্বংস করে। এর পর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দেশের সকল বন্দরে অনুরূপ আরও কয়েকটি অপারেশন চালানো হয় এবং বেশ কিছুসংখ্যক সমুদ্রগামী ও উপকূলীয় জাহাজ বন্দরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পরে ভারতীয় কমান্ডার এম. এন. সুমন্ত এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

১১নং সেক্টর

টাঙ্গাইল জেলা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের। মেজর তাহের যুদ্ধে গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহকে সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহেন্দ্রগঞ্জ ছিল সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এই সেক্টরে প্রায় ২৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর (কমান্ডারদের নামসহ) হচ্ছে: মাইনকারচর (স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ); মহেন্দ্রগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট মিজান); পুরখাসিয়া (লেফটেন্যান্ট হাশেম); ঢালু (লেফটেন্যান্ট তাহের আহমদ এবং পরে লেফটেন্যান্ট কামাল); রংরা (মতিউর রহমান); শিববাড়ি (ইপিআর-এর কয়েকজন জুনিয়র অফিসার); বাগমারা (ইপিআর-এর কয়েকজন জুনিয়র অফিসার); এবং মহেশখোলা (জনৈক ইপিআর সদস্য)। এই সেক্টরে ব্যাপক গেরিলা অপারেশন পরিচালিত হয়। নিয়মিত বাহিনী সীমান্ত এলাকায় মুক্ত অঞ্চল দখল করে রাখে। সুবেদার আফতাব যুদ্ধের সারা নয় মাস ধরে রাহুমনিতে মুক্ত এলাকা দখলে রাখেন। এই সেক্টরে নারীও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে। তাছাড়া টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী তার জেলায় ১৬০০০ গেরিলা যোদ্ধা সংগঠিত করেন এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

[সৈয়দা মমতাজ শিরীন]
[সূত্র: বাংলাপিডিয়া]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৮ই মার্চ ২০২৫ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন– পিআইডি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন'। দিবসটি উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা, নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে নানা আয়োজনে বিশ্বব্যাপী দিনটি পালিত হয়। এ উপলক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি নানা অনুষ্ঠান ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, নারীদের সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ৮ই মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯৭৫ সালে ৮ই মার্চকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। নারী অধিকার রক্ষায় এ দিনটি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর উদ্‌যাপিত হয়। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়: 'অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন'।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষায় ছাত্র-শ্রমিক-জনতা যে অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিল গত জুলাই-আগস্টে তার সম্মুখসারিতে ছিল নারী। লাখ লাখ ছাত্রী বিভিন্ন ক্যাম্পাসে দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়েছে। একাধিক নারী এ গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদতবরণ করেছেন। আমি এ গণ-অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের অদম্য মেয়েরা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বমহিমায় এগিয়ে যাচ্ছেন। নারীর অর্জনকে স্বীকৃতি দিতে 'অদম্য নারী পুরস্কার' ও 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদানসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

[সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৮ই মার্চ ২০২৫]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে ৮ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে 'অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫' প্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন— পিআইডি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: জুলাই বিপ্লবে নারী যোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় অবদান

ছাত্র-জনতার জুলাই আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্তেই মমতাময়ী নারীদের প্রতিবাদী অংশগ্রহণ ছিল অনুপ্রেরণার-উদ্দীপনার। ফ্যাসিস্ট সরকারের ছত্রছায়ায় 'অসীম শক্তিধর' আওয়ামী সন্ত্রাসী, বেপরোয়া র‍্যাব-পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীর তাক করা অস্ত্র-গুলির সামনে তেজোদীপ্ত-সাহসী নারীরা দাঁড়িয়েছিলেন ঢাল হয়ে। তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য টনিক হিসেবে কাজ করে। ফ্যাসিস্ট সমর্থক বা সহযোগী ছাড়া সব শ্রেণি-পেশার নারীরা গণ-আন্দোলনে অংশ নেন। তারা সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়ান অকুতোভয় সৈনিকের মতো। ৩৬ দিনের আন্দোলনে এসব সাহসী বীর নারীর অবদান অনবদ্য। ইতিহাসের পাতায় তারা 'ইতিহাস পরিবর্তনের নায়িকা' হয়ে থাকবেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া কন্যা-জায়া-জননীদের কীর্তিগাথা অবদানকে স্যালুট জানাচ্ছে *দৈনিক যুগান্তর* পরিবার।

উমামা ফাতেমা: শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ে জুলাই গণ-আন্দোলনের বিপ্লবীদের অগ্রভাগে ছিলেন উমামা ফাতেমা। অন্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে রাজপথে ছিল তার সরব উপস্থিতি। বক্তব্য আর স্লোগানে সাহস জোগান এই বিপ্লবী। ৭ই মার্চ শুক্রবার বিকালে *যুগান্তরের* সঙ্গে কথা হয় উমামা ফাতেমার। জুলাই আন্দোলনের বারুদ দিনের কথা সামনে এনে তিনি বলেন, 'নারী সৃষ্টি, নারী শক্তি। সৃষ্টি ও শক্তির এ নারীরা যখন প্রতিবাদী হয়, তখন যে-কোনো জয় নিশ্চিত। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে রাজপথের প্রতিটি সভা-মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন নারীরা। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে দেশ থেকে ফ্যাসিস্ট হাসিনার শাসন চিরতরে মুছে দিতে জীবনবাজি রেখে রাত-দিন রাজপথে ছিলেন আমাদের সংগ্রামী নারীরা। আন্দোলন-সংগ্রামে পাবলিক ও প্রাইভেট-সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা কেউ নারী বা পুরুষ পরিচয় নিয়ে তখন মাঠে নামিনি। আমরা দেখছিলাম একটা দেশের সরকার কীভাবে তার নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করছিল। তাই আমরা পথে নেমেছিলাম।' উমামা বলেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি সেই লড়াকু বোনদের স্মরণ করতে চাই, যারা জীবনবাজি রেখে রাস্তায় ছিলেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন। অভ্যুত্থানের পরে নারী তাদের হিস্যা বুঝে পায়নি। আমি আশা করি, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রগুলো নারীর প্রতি আরও সহনশীল হবে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে গুরুত্ব দেবে। আর সর্বোপরি আমরা এই বাংলাদেশে শুধু নারী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে মর্যাদা পেতে চাই।'

সানজিদা চৌধুরী: ছাত্র-জনতার জুলাই আন্দোলনে 'পেছনে পুলিশ, সামনে স্বাধীনতা'। মনে পড়ে সেই অগ্নিঝরা বাক্যটি? সাহসী শিক্ষার্থী সানজিদা চৌধুরীর এই বক্তব্যে শক্তি পান আন্দোলনকারীরা। একটা চরম বার্তা পায় ফ্যাসিস্ট হাসিনা।

সানজিদা এখনো যে-কোনো অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তার ভাষ্য-আমরা যখন পুলিশ হেফাজতে ছিলাম, তখন তারা (হাসিনার পুলিশ) বলত, 'ওদের মার কিন্তু মেরে ফেল না'। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, ওরা আমাদের ভয় পেয়েছে। আমরা

নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছিলাম। ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনার বিচার দেখার অপেক্ষায় আছি। তাকে দেশে আসতে হবে। আবু সাঈদ, মুগ্ধর রক্তের হিসাব দিতে তাকে আসতে হবে। জুলাই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সানজিদার অংশগ্রহণ ও প্রতিবাদী বক্তব্যের প্রতি এখনো স্যালুট জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও। তার প্রতিবাদী বক্তব্য 'পেছনে পুলিশ, সামনে স্বাধীনতা' নামে একটি গ্রন্থ বাজারে এসেছে।

অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস: জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার সঙ্গে রাজপথে সাধারণ সংগ্রামী নারীরা সন্তানের পাশে ছিলেন মানবিক ও সাম্যের অবস্থান থেকে। পথে নেমেছিলেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকারাও। জুলাই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস পুরো সময় রাজপথে ছিলেন। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনেও সোচ্চার ছিলেন তিনি। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নয়, পারিবারিক শিক্ষার কারণেই শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলে *যুগান্তর*কে জানান তিনি। 'আমার ছাত্রের মুখ চেপে ধরেননি, বাংলাদেশের মুখ চেপে ধরেছেন', পুলিশ তথা ফ্যাসিস্ট হাসিনার সরকারের উদ্দেশে আন্দোলনের সময় শব্দ করেই এমন সাহসী উচ্চারণ করেছিলেন তিনি; যা মুহূর্তে সবার কাছে পৌঁছে যায়। তার কথা শক্তি জুগিয়েছিল আন্দোলনকারীদের।

ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস ৭ই মার্চ শুক্রবার *যুগান্তর*কে বলেন, ১৫ বছরের স্বৈরশাসক নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করেছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার সমাজে একদল লোককে পদ-পদবির লোভ দেখিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। আর বাকিদের আয়নাঘর, গুম, খুন– এসব নারকীয় কাজের মাধ্যমে ভয় সৃষ্টি করেছে।

হাসিনার এমন বর্বর-হিংস্র কাণ্ডে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন নারীরা। রাজপথ থেকে অলিগলি-আন্দোলনে সর্বত্র নারীর উপস্থিতি ছিল। বিশ্বের যে-কোনো আন্দোলনে নারী অগ্রভাগে থাকে। ১৯৫২-১৯৭১ সালেও নারীদের সংগ্রাম, অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রজন্মকে বলব, বিশ্বের ইতিহাসে সবসময়ই নারীরা আন্দোলনের সামনে ছিল। জুলাই অভ্যুত্থানে নারীরা সশস্ত্র পুলিশ, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের গুন্ডাবাহিনীর সামনে বারুদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভবিষ্যৎতেও নারীরা যে-কোনো ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে, তাদের মন্দকাজের বিরুদ্ধে অগ্নি হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ-প্রতিহত করবে। যে-কোনো অন্যায়, অপরাধ এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শুধু নারীই নয়, কোনো পুরুষের পোশাক নিয়ে কথা বলাও বর্বরতা, অসভ্যতা। এ যুগে এসে এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক। ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে; কিন্তু ফ্যাসিবাদ আমাদের মাথার মধ্যে গেড়ে গিয়েছে। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, এটি এর প্রতিফলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আদর্শের ঢাল। শিক্ষা-সভ্যতার চর্চা, লালনপালন, ধারণের উচ্চতম বিদ্যাপীঠ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শামীমা সুলতানা: আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের হত্যা, নির্যাতন ও আটকের ঘটনায় দায়ী করে ১লা আগস্ট নিজ কার্যালয় থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সরিয়ে ফেলে নজির সৃষ্টি করেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. শামীমা সুলতানা। সেই ঘটনা তখন মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয় এবং ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা তখন বলেছিলেন, 'শেখ হাসিনা কোটা আন্দোলন ঘিরে শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণকে হত্যা করেছেন, হামলা চালিয়েছেন, আবার বারবার মিথ্যাচার করেছেন। তিনিই শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার নির্দেশ দিয়েছেন। তার হাতে শিক্ষার্থীদের রক্ত লেগে আছে। রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আমার সন্তানের মতো। যার হাত আমার সন্তানের রক্তে রঞ্জিত, তার ছবি আমার দেওয়ালে রাখতে চাই না। আমার মনে হয়, মানুষের হৃদয় থেকে তার (শেখ হাসিনা) ছবি মুছে গেছে। তাই তার ছবি দেওয়াল থেকে সরিয়ে ফেলেছি।'

৭ই মার্চ শুক্রবার সেই প্রতিবাদী শিক্ষক ড. শামীমা সুলতানার সঙ্গে কথা হয় *যুগান্তরের*। তিনি বলেন, সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ, জাতি, সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি যেভাবে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্র এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছিল, যেভাবে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হচ্ছিল, এগুলো দেখার পর আমি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাথে ৮ই মার্চ ২০২৫ ঢাকার আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পুরস্কার প্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন— পিআইডি

মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি তখন একজন মা হয়ে, একজন শিক্ষক হয়ে, একটা দলের প্রতিনিধি হয়ে স্বৈরাচারের ছবি আমার মাথার ওপর থেকে নামাতে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, এ ছবি থাকা উচিত নয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আমরা চেয়েছিলাম সব ধরনের বৈষম্য দূর হবে। সবাই হাসিমুখে থাকবে। কিন্তু সেটি দেখছি না। এদেশের অর্ধেক নারী। কিন্তু আজ তাদের নিরাপত্তা কোথায়? প্রতিনিয়ত দেখছি তারা নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এই দিনে আমার চাওয়া নারীদের নিরাপত্তা। নারীরা যেন সব জায়গায় সম্মান ও নিরাপত্তা পায়। আমাদের সবার আগে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করতে হবে। এদেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও কম নয়। আমরা নারীর প্রতি আর কোনো বৈষম্য চাই না।

একদিনের নোটিশে শিল্পীরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থানে পুরো সময়ই রাজপথে ছিলেন শিল্পীসমাজ-পরিচালকরাও। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে, আন্দোলনে সাহস জোগাতে কথা বলেছেন তারা। সেই উত্তাল দিনগুলোয় রাজপথে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধনও। ৭ই মার্চ শুক্রবার বাঁধনের সঙ্গে কথা হয় *যুগান্তরের*। তার ভাষ্য, গণ-আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়। অধিকার চাইতে গিয়ে জীবন দিতে হয় ছাত্রদের। আমরা বসে থাকতে পারিনি। বাসার ছাদে, বারান্দায়, রাস্তায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাণ গেল তাদের। শত শত ছাত্র-জনতা শহিদ হলো। ফ্যাসিস্টদের বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন বাঁধন। যখন দেশে গণগ্রেপ্তার হচ্ছে, ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তখন তিনি রাজপথে থেকে প্রতিবাদ করেছেন। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বর্বর ঘটনাগুলো মানতে পারছিলেন না। জীবনবাজি রেখেই রাস্তায় নেমেছিলেন। বাঁধনের ভাষ্য, একদিনের নোটিশে শিল্পীরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। শিল্পী-পরিচালক থেকে শুরু করে লাইটম্যান, সহকারী পরিচালকরা রাস্তায় নেমে আসে। কেন এত মানুষের প্রাণ গেল, এই গণহত্যার বিচার করতে হবে।

শহিদ ১১ নারী: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী আহত হয়েছেন। উত্তরায় বাসার বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ নাঈমা সুলতানার (১৫) মা আইনুন নাহার, প্রবীণ নারী মাসুরা বেগম, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শামীমা সুলতানা, শ্রমজীবী নারী সামিনা ইয়াসমিন, নরসিংদী সরকারি কলেজের শিক্ষক নাদিরা ইয়াসমিন, 'চব্বিশের উত্তরা' সংগঠনের প্রতিনিধি সামিয়া রহমান প্রমুখ। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৩২ শিশু-কিশোর এবং ১১ জন নারী শহিদ হয়েছেন। তথ্য বলছে, শহিদ ১১ নারীর মধ্যে রয়েছেন মায়া ইসলাম, মেহেরুন নেছা, লিজা, রিতা আক্তার, নাফিসা হোসেন মারওয়া, নাছিমা আক্তার, রিয়া গোপ, কোহিনূর বেগম, সুমাইয়া আক্তার, মোসা. আক্তার ও নাঈমা সুলতানা।

[সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৮ই মার্চ ২০২৫]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৮ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ সম্মাননা ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের হাতে 'অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫' তুলে দেন— পিআইডি

অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে ছয়জন অদম্য নারীর হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ৮ই মার্চ সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এই সম্মাননা প্রদান করেন।

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে যেসব নারী এই সম্মাননা পেয়েছেন, তারা হলেন– অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য শরিফা সুলতানা, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অবদানের জন্য হালিমা বেগম, সফল জননী হিসেবে মেরিনা বেসরা, জীবনসংগ্রামে জয়ী নারী হিসেবে লিপি বেগম, সমাজ উন্নয়নে অসাধারণ অবদানের জন্য মো. মুহিন (মোহনা) এবং বিশেষ সম্মাননা হিসেবে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল।

পুরস্কার বিতরণী এ অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ এনডিসি। নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজে তাদের অসামান্য ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ এ ধরনের সম্মাননা ভবিষ্যতেও চালিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান অনুষ্ঠানের অতিথিরা।

[সূত্র: ইত্তেফাক, ৮ই মার্চ ২০২৫]

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৮ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে ৫ জন নারীর হাতে 'অদম্য নারী পুরস্কার ২০২৫' তুলে দেন— পিআইডি

রমজানের তাৎপর্য ও শিক্ষা

মুহাম্মদ ইসমাঈল

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হলো সাওম। ইবাদত হিসেবে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়। প্রকৃত তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং আল্লাহ প্রেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাওম এক অতুলনীয় ইবাদত। আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সাওম এক অনিবার্য ও অপরিহার্য ইবাদত। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সহানুভূতি ও সাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও সাওমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের নৈতিক ও দৈহিক শৃঙ্খলা বিধানে সাওমের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সাওমের পরিচয়

রমজান শব্দটির প্রতিশব্দ হলো সাওম, এটি আরবি শব্দ, বহুবচনে সিয়াম। এর ফারসি শব্দ হলো রোজা। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা, কঠোর সাধনা, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম ইত্যাদি। আর রামাদান অর্থ দাহন বা জ্বালিয়ে দেওয়া। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় রোজা বা সাওম হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের (প্রকৃষ্ট উষা) আভা ফুটে ওঠার সময় থেকে সাওমের নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হতে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা সাওম বা রোজা।

সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব ও শিক্ষা

১। সাওম ফরজ ইবাদত

পবিত্র কোরান, হাদিস ও ইজমার দ্বারা রমজানের পূর্ণ একমাস সাওম ফরজ হওয়ার নির্দেশ প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি এটা অস্বীকার করে তবে সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সাওম ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য; যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৩)

২। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন

আত্মাকে কলুষমুক্ত করে পরিশুদ্ধ করে আত্মশুদ্ধি ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথকে প্রসারিত করে দেয়। মহানবি স. বলেন, 'রোজাদারের জন্য দুটি খুশি; একটি তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়।' (বুখারী-৭৪৯২, মুসলিম)

৩। তাকওয়া সৃষ্টিতে

সাওমের বিধিনিষেধ ও নির্দেশ পালনে আল্লাহ আর রোজাদার ব্যতীত কেউ জানে না। একমাত্র আল্লাহর ভয় এক্ষেত্রে কার্যকর থাকে। তাই তাকওয়া অর্জন এবং তাকওয়াভিত্তিক চরিত্র গঠনই সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য; কিন্তু রোজা ব্যতিক্রম এটা অবশ্যই আমার জন্য; আর আমিই এর প্রতিদান দেব।' (বুখারী-১৯০৪, মুসলিম)

৪। আল্লাহ প্রেমের নিদর্শন

রোজা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসারই নিদর্শন। আল্লাহ রোজাদারকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। হাদিসে আছে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

৫। রোজা ঢাল স্বরূপ

সিয়াম সাধনা মানুষকে পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক চাহিদা, কামনা বাসনা এবং শয়তানের প্ররোচনামূলক সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। একারণেই মহানবি স. বলেন, 'রোজা ঢাল স্বরূপ'। (বুখারী, তিরমিজি, মিশকাত-২৯)

৬। রোজা মুক্তির উপায়

কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোজা মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। রাসূল স. বলেন, 'রোজাসমূহ সুপারিশ করে বলবে হে প্রভু। আমি এ ব্যক্তিকে দিনে পানাহার ও অন্যান্য কামনাবাসনা হতে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করবেন।' (বায়হাকী)

৭। রোজা গুনাহ মার্জনকারী

মহান করুণাময় আল্লাহ রোজাদার বান্দার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ও অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। মহানবি স. বলেন, 'যে বক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রোজা পালন করল; সে পূর্বকৃত গুনাহ মার্জনা করে নিল।' (বুখারী-৩৮)

তিনি আরও বলেন, 'যারা রমজান মাসের প্রথম হতে শেষ নাগাদ রোজা পালন করেছে, তারা শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে।'

৮। রোজা চরিত্র গঠনে সাহায্য করে
রোজা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। সিয়াম রিপুসমূহ ধ্বংস করে দিয়ে কামনাবাসনার শিক্ষা নির্ধারণ করে। লালসা দগ্ধ করে দিয়ে মুমিনের দেহ ও আত্মাকে নিষ্কলুষ পবিত্র শিশুর মতো নিষ্পাপ করে তুলতে সাহায্য করে।

৯। আরশের ছায়ায় স্থান লাভ
কঠিন ভয়াবহ হাশরের মাঠে সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, যেদিন সবাই স্বীয় কৃতকর্মের হিসাবনিকাশ দেওয়ার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করবে- সেই বিভীষিকাময় দিনে রোজাদারগণ আল্লাহর আরশের নীচে স্থান পাবে।

১০। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির সূত্র
সিয়াম পালনের মাধ্যমে রোজাদারের হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা মানসিক একাগ্রতা, নিষ্ঠা, আত্মনিবেদন এবং আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা অর্জিত হয় এবং যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে বান্দা পূতপবিত্র হয়ে পরমাত্মা আল্লাহর সাথে যোগসূত্র সৃষ্টি হয়।

১১। সংযম ও আত্মশক্তি অর্জন
সিয়াম পালনের মাধ্যমে রোজাদারের মধ্যে সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মশক্তি অর্জন হয়। রমজান আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের মাস। সিয়ামের মাধ্যেমে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংযমের পরীক্ষা হয়। আর সে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ মুমিন দেহ ও মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজেকে সংশোধন করার সাধনায় ব্রতী হয়। ইমাম গাজ্জালী বলেন, 'দৈহিক কৃচ্ছতা এবং সংযমের সাথে যখন অন্তরের সাধনাযুক্ত হয়, তখন আদর্শ সংগ্রাম চেতনা শ্রেষ্ঠতায় প্রতিফলিত হয় রমজানের সিয়াম সাধনায়।'

১২। সবর বা ধৈর্যশীলতা
জীবন ও সত্যের সংগ্রামে প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন হয় সবরের। গুণাবলি সৃষ্টির কার্যকর ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় সিয়াম সাধনায়। এজন্য মহানবি স. রমজানকে ধৈর্যের মাস বলে আখ্যায়িত করেন। মহানবি স. বলেন, 'এ মাস ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাতের পরম সুখ।' (মিশকাত-১৯৬৫)

১৩। ধর্মীয় এবং নৈতিক অনুশীলন
অনুশীলন হিসেবে সিয়ামের অন্য একটি তাৎপর্য এই যে, এর মাধ্যমে রোজাদার স্বেচ্ছায় ও সচেতনতায় নিজেকে বিরত রাখে সবর করে দৈহিক সম্ভোগ ও প্রচলিত সুযোগসুবিধা থেকে এবং পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত রাখে।

১৪। নাজাত ও জান্নাত লাভের মাধ্যম
বান্দা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট ও তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পানাহার, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও সর্ব প্রকার পাপাচার হতে বিরত থাকে, তাই আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। এ মর্মে মহানবি স. বলেন, 'এটা এমন একটি মাস যার প্রথম ভাগ আল্লাহর রহমত, মধ্যভাগ গুনাহের মাগফিরাত এবং শেষভাগে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিলাভ রয়েছে।' *(মিশকাত-১৯৬৫)* তিনি আরও বলেন, 'জান্নাতের ৮টি প্রবেশদ্বার আছে। তার মধ্যে একটির নাম রাইয়্যান। সাওম পালনকারী ব্যতীত কেউ এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারী-৩২৫৭) বস্তুত সিয়াম সাধনার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত রহমত, বরকত ও মাগফিরাত।

সাওমের সামাজিক শিক্ষা

১। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি:
সামাজিক জীবনে মানুষ রোজার অনুশীলনের মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসার অসহ যাতনা অনুভব করতে পারে। ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা যে কী রূপ ভয়ংকর তা উপলব্ধি করে অভাবী ও নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হতে পারে। ফলে সমাজের মানুষ পারস্পরিক বিভেদ বৈষম্য ভুলে সমশ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে। মহানবি স. বলেন, 'এ মাস সহানুভূতির মাস।' (মিশকাত-১৯৬৫)

২। সাম্য প্রতিষ্ঠা
সৃষ্টির সকল মানুষ যে মহান আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষে মানুষে সে সমঅধিকার রয়েছে, রোজার মাধ্যমে তার বাস্তবতা অনুভূত হয়ে থাকে। রোজার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সব মানুষই এক কাতারে চলে আসে।

৩। ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে
রোজার মাধ্যেমে মানুষ একই আল্লাহর আদেশ একই নিয়মে পালন করে থাকে। একে অপরের সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসা অনুভূত হয়ে থাকে। ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

৪। সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে :
রোজা সমাজের অবহেলিত ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। মহানবি স. বলেন, 'এ মাসে যারা দাসদাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তথা তাদের কাজের বোঝা হালকা করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা করেন।'

৫। আদর্শ সমাজ গঠন
সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ ষড়-রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি পায়। ফলে লোভ-লালসা, ঝগড়া, বিবাদ, অশ্লীলতার চর্চা প্রভৃতি থেকে পূতপবিত্র হয়ে সুন্দর আদর্শ জীবন লাভ করে। সমাজের ওপর স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলে।

৬। ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায়
সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মার মধ্যে হিম্মত ও বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার সুযোগ ত্বরান্বিত ও সহজ সাধ্য হয়। তাইতো সিয়ামের শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ পরিবার সংশোধনের পাশাপাশি দেশ, জাতি, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন গঠনের সহায়ক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করে তোলে।

৭। জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের চেতনায়
সিয়ামের এ মাসেই আল্লাহর বিধান ও শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

আসে। এ মাসেই বদরের যুদ্ধে ইসলামের দুশমনদের পরাজিত করেন। এ মাসে মক্কা জয় করে বায়তুল্লাহকে তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলিম বিশ্বের দ্বীন দুনিয়ার সমৃদ্ধি, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, দৈহিক ও মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব আর তাদের গৌরব ও মর্যাদার অবিস্মরণীয় স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে এ সিয়াম মাস।

৮। ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের ট্রেনিং কোর্স

মাহে রমজান ১২ মাসের মধ্যে এক মাসের ট্রেনিং কোর্স। এ কোর্সে অর্জিত দক্ষতা বাকি ১১ মাস কাজে লাগাতে হবে। রোজার মাধ্যমে যেসব গুণাবলি অর্জিত হবে তাই হবে আল্লাহর বান্দা হিসেবে দায়িত্ব পালনের দক্ষতা। এ দক্ষতা দ্বারা মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করাই হচ্ছে মানুষের কাজ।

৯। দৈহিক সুস্থতা বিধান

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে দেহযন্ত্রের পরিপাকযন্ত্রের ও মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন। অব্যাহত ভোগ দেহযন্ত্রকে ক্লান্ত ও একঘেয়ে করে দিতে পারে। তাই মাঝে মাঝে উপবাস স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। তাছাড়া দেহকে ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করার শক্তি ও আত্মবিশ্বাস একজন সংগ্রামী মানুষের জীবনে একান্তই অপরিহার্য।

১০। পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলে

পবিত্র রমজান মুসলমানদের জন্য এক সুন্দর পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে পুণ্যময় জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে। গোটা পরিবেশ যেন পুণ্যের আবেশে আবিষ্ট হয়ে রহমতের ফলগুধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। এ মর্মে মহানবি স. বলেন, 'রমজান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়।'

১১। আর্থসামাজিকতার ক্ষেত্রে

বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত আর্থসামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাওম বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। সিয়ামের মাধ্যমে ধনীরা ও ক্ষুধা পিপাসার যন্ত্রণা যে কত ভয়াবহ তা উপলব্ধি করতে পারে বিধায় তারা অভাবমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য দান-খয়রাত, জাকাত-ফিতরা ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসে।

রোজা সমগ্রদেহের

রোজা শুধু পেটের নয়, সমগ্রদেহের। জিহ্বা, কানের, নাকের, চোখের, হাতের, পায়ের, যৌনাঙ্গের, মস্তিষ্কের, সর্বোপরি অন্তরের। রাসূল স. বলেন, 'এমন অনেক রোজাদার আছে যাদের রোজার বিনিময় ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই মেলে না।' (ইবনে মাজা-১৬৯০)

রাসূল স. আরও বলেন, '৫টি ব্যাপার রোজাদারের রোজা নষ্ট করে দেয়।' সেগুলো হলো– ১। মিথ্যে বলা, ২ চোগলখুরি বা কুটনামী করা, ৩. পেছনে নিন্দা করা, ৪. মিথ্যা কসম করা, ৫. কামভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করা। সুতরাং রোজার প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে তথা তাকওয়া অর্জনের জন্য সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ হতে বিরত রাখতে হবে সেসব বিষয় নিয়ে উল্লেখ করছি।

১। অন্তরের রোজা

রোজা হলো তাকওয়ার পরিচায়ক। আর রোজার ভিত্তি হলো অন্তরে আল্লাহভীতি জাগ্রত করা। সুতরাং শুধু দৈহিক ক্ষুধা নিবারণের মধ্যেই রোজা সীমাবদ্ধ নয়; বরং দেহের পরিচায়ক অন্তরের রোজাই আসল রোজা। সৎ মানসিকতা, চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রকৃতিকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত হতে হবে। অন্তরের রোজা বলতে বুঝায়, অন্তরকে শিরক থেকে মুক্ত, বাতিল আকিদা বিশ্বাস থেকে দূরে এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট মনোভাব থেকে খালি রাখতে হবে। তাহলেই অন্তরে রোজা রাখা হবে।

২। পেটের রোজা

ক. হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন : হালাল রুজি ইবাদতের পূর্বশর্ত। হালাল উপার্জনের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমার দেওয়া পবিত্র হালাল রিজিক খাও।' (*সূরা বাকারা*, আয়াত : ১৭২) আল্লাহ আরও বলেন, 'হে রাসূল! তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাবার গ্রহণ কর।' (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১)

হারাম উপার্জনের মাধ্যেমে উপার্জিত ধনসম্পদ ভোগ করা হারাম। আর হারামের দ্বারা যে দেহ গঠিত হবে, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। হারাম খাবার বর্জন করতে হবে। হারাম উপার্জনের কয়েকটি দিক হলো- মদ, মৃতজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, জুয়া, প্রতারণা, ছলচাতুরী করে উপার্জন, ভেজাল দেওয়া, মজুদ করা, ওজনে কম দেওয়া, সুদ, ঘুষ, পরের সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে উপার্জন হারাম। হারাম উপার্জন ভক্ষণ না করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন। রাসূল স. বলেন, 'কেউ যদি হারাম খাদ্যের একগ্রাস ও মুখে নেয়, তাহলে ৪০ দিন যাবৎ তার দোয়া কবুল হবে না।' (তাবারানী-৬৪৯৫)

খ. অল্প খাবারে তুষ্ট থাকা

ইফতার কালে পেটভর্তি করে হালাল খাদ্য ভক্ষণ না করা। কারণ আল্লাহর দরবারে হালাল বস্তু দ্বারা বোঝাই উদর অপেক্ষা অধিক মন্দ পাত্র দ্বিতীয় নেই। রোজার উদ্দেশ্য হলো উদর খালি রেখে প্রবৃত্তির কামনা বাসনাগুলো কে নিস্তেজ ও দুর্বল করে ফেলা, যাতে তাকওয়া সবল হয়। কিন্তু ইফতারের সময় নানাবিধ উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য অতিরিক্ত খাবার ফলে কুরিপুর শক্তি ও আনন্দ অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং পূর্বাপেক্ষা বেশি করে কুবাসনা জাগ্রত করে। মোট কথা মন্দ কাজের দিকে যে অপশক্তিগুলো টেনে নেয়, সেগুলোকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই রোজা তার মূল কথাই অল্প আহার।

৩। চোখের রোজাঃ

চোখের রোজা হলো দৃষ্টি অবনত রাখা। রাসূল স. বলেন, 'খারাপ

বিষয়ের দিকে নজর করা শয়তানের বিষাক্ত এক তিল সদৃশ।' যে নিজের চোখ অবনত রাখে না কিংবা নিষিদ্ধ জিনিসের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে না। সে ৪টি ক্ষতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেগুলো হচ্ছে- ১. লাগামহীন দৃষ্টির কারণে তার অন্তর বিচ্ছিন্ন থাকে শান্তি পায় না, মনে হয় আহত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। চোখ হচ্ছে বিষাক্ত ছুরি, সেই ছুরির আঘাতে মন ব্যথিত, অশান্ত ও অস্থির থাকে, ২. যা চোখ দেখল, তা না পাওয়ার কারণে মন কষ্ট পায় এবং সবর্দা আফসোস, দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটায়। ৩. আল্লাহর ইবাদতে স্পৃহা চলে যায়, আনুগত্যের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং খারাপ কাজের প্রতি উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ৪. নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পরকালে এই চোখের ওপর শিশা ঢেলে শাস্তি দেওয়া হবে। চোখ হচ্ছে উত্তম শিকারি। তাকে খোলা রাখলে সে যে-কোনো সময় পাপের বস্তু শিকার করবে এবং অন্তর ও ঈমানকে নষ্ট করে দেবে।

৪। কানের রোজা

কানের রোজা হচ্ছে অশ্লীল গান-বাজনা ও কথা যেন কানে প্রবেশ না করে। যে কথাগুলো বলা নিষিদ্ধ তা শ্রবণ করা ও নিষিদ্ধ। এজন্যই আল্লাহ মিথ্যে শ্রবণকারী ও হারামখোরদের কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা মিথ্যে শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী।' (সূরা মায়েদা-৪২) মহান আল্লাহ আর ও বলেন, 'নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' (সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬)

যারা পাপী ও গুনাহগার তারা মন্দও অশ্লীল গান বাজনাসহ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো শুনে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আমি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, যাদের অন্তর আছে কিন্তু বুঝে না, চোখ আছে দেখে না এবং কান আছে শুনে না, তারা হচ্ছে পশু কিংবা এ চাইতেও নিকৃষ্ট।' (সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯)

৫। জিহ্বার রোজা

জিহ্বার রোজা হলো– বাজে কথা, মিথ্যা বা অসত্য কথা, পরনিন্দা, চোগলখুরি, গীবত, অশ্লীল কথা, জুলুম, কলহবিবাদমূলক এবং রুক্ষ ও কর্কশ কথা বলা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং তেলাওয়াত, জিকিরের মাধ্যমে জিহ্বাকে রত রাখা। জিহ্বার মাধ্যমে ১৫টির ও অধিক পাপ হতে পারে।

জিহ্বার হিফাজত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'কোন কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে।' (সূরা ক্বাফ : ১৯)

রাসূল স. বলেন, 'যে আমাকে তার দুই ঠোঁট ও দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার বেহেশতের নিশ্চয়তা দেবো।' (বুখারী-৬৪৭৪)

রাসূল স. আরও বলেন, 'কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই রোজা নয় বরং রোজা হচ্ছে বেহুদা কথা ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা।' (ইবনের হিববান : ৩৪৭৯)

অতএব, রোজা রেখে মিথ্যা কথা বলা, নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি তাকানো, নিষিদ্ধ কথা বলা ও শোনা, সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। জিহ্বার, কানের, চোখের, হাতের, পায়ের, যৌনাঙ্গের, মস্তিষ্কের, সর্বোপরি অন্তরের রোজা রাখতে হবে।

মুহাম্মদ ইসমাঈল: কবি, প্রাবন্ধিক, সাবেক শিক্ষক, muhammadismail51111@gmail.com

রমজানে সুলভ মূল্যে দুধ-ডিম-মাংস বিক্রয়

পবিত্র মাহে রমজান মাস উপলক্ষে রাজধানীর ২৫টি পয়েন্টে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে সুলভ মূল্যে দুধ-ডিম এবং মাংস বিক্রি করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর দক্ষিণ বারিধারা আবাসিক এলাকার (ডিআইটি প্রজেক্ট) সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল মডেল স্কুল প্রাঙ্গণে রমজানে সুলভ মূল্যে বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। উদ্বোধন কার্যক্রমে ফরিদা আখতার বলেন, ব্রয়লার (ড্রেসিং করা) প্রতি কেজি ২৫০ টাকা, পাস্তুরিত দুধ ৮০ টাকা, ডিম প্রতি ডজন ১১৪ টাকা এবং গরুর মাংস ৬৫০ টাকায় বিক্রি করা হবে। তিনি আরও বলেন, বাজারে অন্যায়ভাবে যারা পণ্যের দাম বাড়াবে, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।

উপদেষ্টা বলেন, ঢাকা শহরের ২৫টি স্থানে সুলভ মূল্যে প্রাণিজাত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জুলাই বিপ্লবের সময় যে সকল স্থানে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বেশি ছিল, সে সকল স্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং বস্তি এলাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। এলাকাগুলো হচ্ছে– সচিবালয়ের পাশে (আব্দুল গণি রোড), খামারবাড়ী (ফার্মগেট), ষাটফুট রোড (মিরপুর), আজিমপুর মাতৃসদন (আজিমপুর), নয়াবাজার (পুরান ঢাকা), বনশ্রী, হাজারীবাগ (সেকশন), আরামবাগ (মতিঝিল), মোহাম্মদপুর (বাবর রোড), কালশী (মিরপুর), যাত্রাবাড়ী (মানিক নগর গলির মুখে), শাহাজাদপুর (বাড্ডা), কড়াইল বস্তি, বনানী, কামরাঙ্গীর চর, খিলগাঁও (রেল ক্রসিং দক্ষিণে), নাখাল পাড়া (লুকাস মোড়), সেগুন বাগিচা (কাঁচা বাজার), বসিলা (মোহাম্মদপুর), উত্তরা (হাউজ বিল্ডিং), রামপুরা (বাজার), মিরপুর ১০, কল্যাণপুর (ঝিলপাড়), তেজগাঁও, পুরান ঢাকা (বঙ্গবাজার), কাকরাইল। প্রতিদিন সম্ভাব্য বিক্রয়ের পরিমাণ ডিম: ৬০ হাজার পিস; পাস্তুরিত দুধ: ৬ হাজার লিটার; ড্রেসড ব্রয়লার: ২ হাজার কেজি ও গরুর মাংস: ২০০০-২৫০০ কেজি।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

জাকাত অর্থনীতির স্বরূপ ও ভূমিকা

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

জাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। *আল কোরানে* সালাত বা নামাজ কায়েমের নির্দেশের পরপরই প্রায় ক্ষেত্রে জাকাত আদায়ের কথা এসেছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বা সঞ্চয় থাকলে জাকাত আদায় আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। জাকাত আদায় সম্পদশালী ব্যক্তির পক্ষ থেকে দুস্থ দরিদ্রের প্রতি সাহায্যের আদেশ প্রতীয়মান হলেও এটি মূলত জাকাত আদায়কারীর কল্যাণ বাড়ানোর জন্যই।

পবিত্র *কোরানে* জাকাত-সংক্রান্ত মুখ্য নির্দেশনাগুলো হলো:

১. '(হে রাসূল) তাদের মালামাল থেকে সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করুন যাতে আপনি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারেন এর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।' (সূরা তাওবাহ-১০৩)

২. সাদাকা তো কেবল ফকির-মিসকিনদের জন্য এবং সাদাকা-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তাওবাহ-৬০)

আল কোরানের নবম সূরা তাওবার মধ্যে জাকাত আদায় ও প্রদানের বিষয়টি সবচেয়ে বেশিবার বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে– তবে তারা যদি তাওবাহ করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত দেয় তাহলে তাদের 'পথ ছেড়ে দাও' (আয়াত-৫), তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই (আয়াত-১১), তারা হেদায়েত প্রাপ্ত (আয়াত-১৮)। যখন জাকাত বণ্টনের ব্যাপারে বৈষম্যের দোষারোপ করা হয়, বলা হয়, জাকাত পেলে খুশি হয়, না পেলে ক্ষুব্ধ হয় (আয়াত-৫৮)। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কারা সাদাকা বা জাকাত প্রাপক হবে তার নির্দেশনা বা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ৬০ নম্বর আয়াতে। এরপর ৬৯ নম্বর আয়াতে এসে বলা হলো– (জাকাত না দিয়ে) অতীতের লোকেরা তাদের ধনসম্পদের ফায়দা নিয়েছে ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৭১ নম্বর আয়াতে এসে আবার বলা হয়– যারা নামাজ কায়েম করেছে এবং জাকাত দেয়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ৯৮ নম্বর আয়াতে জাকাতকে জরিমানা বলার চেষ্টা করেছে মুশরিকরা, ৯৯ নম্বর আয়াতে এসে বলা হয়েছে– জাকাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। ১০২ নম্বর আয়াতে এসে বলা হয়েছে– কোনো কোনো লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করছে এবং নেককাজ ও মন্দকাজ মিশ্রিত করেছে, শিগ্‌গিরই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১০৩ নম্বর আয়াতে এসে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে– '(হে রাসূল) তাদের মালামাল থেকে সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করুন যাতে আপনি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পারেন এর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন।' পরবর্তী ১০৪ নম্বর আয়াতে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে– 'তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং সাদাকা (জাকাত) গ্রহণ করেন? বস্তুত আল্লাহই তাওবাহ কবুলকারী, করুণাময়।'

জাকাত প্রদান ধনবান ব্যক্তি, পরিবার বা সমাজের মন-মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধনের সুযোগ এনে দেয়। অর্থের প্রাচুর্যের জন্য মানুষের মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা অপরকে হেয় জ্ঞান করার প্রবণতা এবং নৈতিক অধঃপতন বৃদ্ধি পায়। এই চারিত্রিক দোষত্রুটি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য নিজের অর্জিত সম্পদের কিছু অংশ অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করা অপরিহার্য। জাকাত প্রদানের ফলে সামাজিক বৈষম্যবোধ হ্রাস পেয়ে পারস্পরিক ঐক্য স্থাপিত হয়। এই পারস্পরিক ঐক্যবোধই পরে উন্নত নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। সমাজ একমাত্র অর্থনৈতিক উপকরণাদির মাধ্যমে অভাবীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

এই পদ্ধতি যথার্থ অনুসৃত হলে সমাজকে ভিক্ষার অভিশাপ হতে মুক্ত করা সম্ভব। সমাজের গোষ্ঠীবিশেষের হাতে জাতীয় সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে জাকাত ব্যবস্থা তাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড জাকাত। সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কারও হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকা নয়, মানুষের কল্যাণে তার ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের চাকা সচল ও গতিশীল রাখার স্বার্থে জাকাতের বিধান। ইসলামের জাকাত ব্যবস্থা মুনাফার ওপর আরোপিত কোনো পদ্ধতি নয়; বরং মূল পুঁজির ওপর এর দাবি। এর উৎস ও দার্শনিক তাৎপর্য হলো– এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে সম্পদ গুটিকয়েক লোকের মধ্যে আবর্তিত না হয়। বস্তুত এটিই প্রকৃত কল্যাণ অর্থনীতির আদর্শিক রূপ। জাকাত প্রদান মূলত দুটি কর্মসূচিরই নির্দেশ করে। ১. সম্পদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হিসাব করে প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ২. সেই অর্থ কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত। জাকাত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে বিত্তবানের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন শুরু হয় এবং প্রকৃত প্রাপক ব্যক্তিকে উপযুক্ত উদ্দেশ্যে প্রদানের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন শেষ হয়।

জাকাত প্রদানে কোনো প্রকার অহংকার বা দম্ভের প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। আবার তা এমনভাবে প্রদান করা উচিত, যাতে প্রাপক প্রকৃতই আর্থিক সচ্ছল কিংবা স্বনির্ভর হতে পারে। জাকাত গ্রহণ কারও কাছে যেন অব্যাহত পরনির্ভরশীলতা ও অসহায়ত্বের অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাকাত বিতরণ উপলক্ষে অসহায় আর্তমানবতার প্রচণ্ড ভিড় জমে। সেই ভিড়ের চাপে মানুষের মৃত্যু হয়, যা এক করুণ ও অনভিপ্রেত অবস্থার নির্দেশ করে। যৎসামান্য সাহায্য প্রাপ্তিতে প্রাপকের অতি সাময়িক সংস্থান হয়। তার সার্বিক উন্নয়নে এর কোনো অবদান নেই। মানুষের বেকারত্ব বৃদ্ধি, বিপন্ন নারীত্বের অসহায়ত্ব, দুঃখ ও দারিদ্র্যতাড়িত আর্তনাদ নিয়ন্ত্রণ করা জাকাত ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিক্ষিপ্তভাবে নয়, অসহায়কে অধিক পরনির্ভরশীল হতে দেওয়া নয়; বরং স্বাবলম্বনের দিকে মনোবল বৃদ্ধি ও কর্মপ্রেরণার দিকে উৎসাহিত করা জাকাত ব্যবস্থার অন্যতম কর্মসূচি হওয়া উচিত। আয়ের সংস্থান হয় এমন কিছু কিনে দিয়ে জাকাত প্রার্থীকে স্বাবলম্বী হওয়ায় সহায়তা করা যেতে পারে। একার অর্থে না হলে কয়েকজনের জাকাতের অর্থ একত্র করে গঠনমূলক কিংবা কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে। জাকাত ফান্ডে জমাকৃত জাকাতের অর্থ দিয়ে আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় সমন্বিতভাবে এমন প্রকল্প গ্রহণ করা যায়।

দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ ও উৎস। গরিবের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের যে সংকট তা ব্যক্তি, পরিবার সমাজের স্বাস্থ্য শিক্ষা নিরাপত্তায় যেমন সমস্যার সৃষ্টি করে, সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পরিবেশও বিনষ্ট করে। সার্বিক পুষ্টিহীনতায় স্বভাব চরিত্রে নৈতিকতায় ঠিক থাকা থেকে শুরু করে এমনকি দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যম ও আগ্রহের ক্ষেত্রেও জড়তা স্থবিরতা এসে যায়। এটি একটি ভয়াবহ ঘূর্ণাবর্ত।

সুতরাং শুধু অন্ন, শুধু বস্ত্র, শুধু বাসস্থান দিলেই দারিদ্র্য নিরসন হবে না। এ সম্পর্কিত কার্যক্রমকে হতে হবে দারিদ্র্যের সার্বিক ও সমূলে নিরসনের কার্যকর উদ্যোগ। ব্যক্তির দারিদ্র্য সমাজের দারিদ্র্যের প্রতিফল হিসেবে দেখতে হবে। সুতরাং সমন্বিতভাবে সংঘবদ্ধ দারিদ্র্য নিরসনের কর্মসূচি প্রয়োজন।

বিদ্যমান ধ্রুপদ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক দারিদ্র্য নিরসনে একটি মাত্র অবলম্বন হিসেবে প্রতিভাত হতে পারে, তা ব্যক্তির কর্মসৃজন ও তার বা বড়োজোর তার পরিবারের উন্নয়ন ইচ্ছার বাস্তবায়ন, এমনকি তার ক্ষমতায়ন হতে পারে; কিন্তু যে সমাজে তার অবস্থান, যে পরিবেশে তার চলাচল সেই সমাজ ও পরিবেশে দারিদ্র্য বিদ্যমান থাকলে তার একার বা পরিবারের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি অর্থবহ ও টেকসই হবে না। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির উদ্ভাবকরা তাই এখন সামাজিক ব্যবসায় ধারণার প্রচার প্রসার কামনা করছেন এ কারণে যে, সমাজকে শক্তিশালী হতে হবে। এজন্য সামাজিক ব্যবসায়, যে ব্যবসায় সমাজে এমন সক্ষমতা তৈরি হবে যাতে সব প্রকার দারিদ্র্য (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, চিন্তাচেতনার, সবকিছুর) নিরসন সম্ভবপর হবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে কিংবা যথার্থ কার্যকারিতার অবর্তমানে জাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য নিম্নের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক. সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি তথা সংস্থা বা সংগঠন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিকল্প বা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামি শরিয়তের বিধানাবলি বাস্তবায়নে জাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারে।

খ. শরিয়তসম্মতভাবে পরিচালিত ব্যাংক বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমেও জাকাত উসুল ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি করে জাকাত বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। ঐ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ব্যাংক জাকাত দানকারী সাহিবে নিসাবদের কাছ থেকে জাকাতের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। নিজ গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকেও তাদের অনুমতিসাপেক্ষে জাকাত সংগ্রহ করে জাকাত ফান্ডে জমা করতে পারে এবং জাকাত বোর্ডের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে হকদারদের মধ্যে তা বণ্টন করতে পারে।

সুতরাং সার্বিক দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস, এমন উদ্যোগ যা নিরাপদ ও কল্যাণপ্রদ অর্থ উৎসারিত এবং স্বয়ম্ভর সক্ষমতা সৃষ্টির দ্যোতক।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান, mazid.muhammad@gmail.com

ঈদ-উল-ফিতরের পুরস্কার: রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে সম্প্রীতির সেতু

খান চমন-ই-এলাহি

পবিত্র কোরানে স্বয়ং আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি উৎসবের দিন নির্ধারণ করে দিয়েছি। এমন সূত্র ধরেই মাহে রমজান শেষে প্রতি বছর ফিরে আসে ঈদ-উল-ফিতর। আর পবিত্র জিলহজ মাসের পরে ফিরে আসে ঈদ-উল-আজহা অর্থাৎ বছরে দুটি ঈদ ফিরে আসে। হ্যাঁ অভিধান, আরবি ইতিহাস এবং ইসলাম নিয়ে যায় চিরায়ত আনন্দ নদীর বাঁকে। মুসলমান এবং বিশ্বসম্প্রদায় খুঁজে পায় নতুন ঠিকানা। নবতর নির্দেশনা।

ইসলামে 'ঈদ' শব্দটির যে ব্যবহার দেখা যায় তা 'আওদ্' থেকে উৎকলিত। শাব্দিক অর্থ ঘুরে ঘুরে ফেরা কিংবা প্রত্যাবর্তন করা। 'ঈদ' শব্দটি কাল বিচারে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তরে বাহিরে গৃহীত হয়েছে। কারণ জাহেলি যুগের ঈদ আর বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত পরবর্তী সময়ের ঈদের নিজস্বতা ও তাৎপর্য– গুরুত্ব এক নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কারণ জাহেলি যুগে ঈদ ছিল শুধু দুনিয়ার বিষয়। আনন্দ-ফুর্তি প্রকাশের বিষয়। খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার বিষয়। মদিনাবাসী জাহেলি যুগে বসন্তের পূর্ণিমায় 'মেহেরজান' আর শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' নামের দুটি উৎসব পালন করত। জাহেলি যুগের বর্বর ধারণা ইসলাম ভেঙে দেয়। নওরোজ উৎসবে আমজনতার অধিকার ছিল একদিনের জন্য। কিন্তু নওরোজ উৎসব হতো ৬ দিনব্যাপী। ধনী আর অভিজাত শ্রেণির জন্য জমকালো বা মহা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হতো। সাধারণ মানুষ সেখানে ছিল মূল্যহীন। একদিন মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) এসব নিয়ে কথা বললেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে আল্লাহর রাসূল (স.) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত কারণ, এ সময়ে আকায় নামদার তাজে মদিনা হজরত মুস্তফা (স.) সাহাবিদের সঙ্গে কথা বললেন। ফলে আল্লাহর রাসূল হজরত আনাস (রা:) থেকে যা অবগত হলেন তা ঈদ সম্পর্কে নতুন ভাবনার জায়গা করে দেয়।

মদিনাবাসীর বছরের দুটি উৎসব নিয়ে মহানবি (স.) সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবি আনাস (রা.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, জাহেলি যুগে আমরা এই দুই দিবসে খেলাধুলা বা আনন্দ প্রকাশ করতাম। তখন এমন কথার জবাবে রাসূল (স.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত দিন দুটির পরিবর্তে তা অপেক্ষা উত্তম দুটি দিন তোমাদের খুশি প্রকাশ করার জন্য দান করেছেন এর একটি হচ্ছে ঈদ-উল-আজহা এবং অপরটি হচ্ছেঈদ-উল-ফিতর।

ইসলামের ইতিহাসে সংস্কৃতির মহামহিম মাধ্যম হলো ঈদ। শরিয়তে আনন্দ বা খুশি প্রকাশে আর বাধা থাকল না। জাহেলি যুগের নওরোজ ও মেহেরজান বা বসন্ত ও শরতের পরের অনুষ্ঠানের দিকে মদিনাবাসী চেয়ে থাকল না। তারা মহান আল্লাহর রাসূল হজরত মুহাম্মদ (স.) এর নির্দেশিত পথে ঈদ গ্রহণ করল।

ঈদ কোনো ছোটো বিষয় নয়। ঈদ হলো চাওয়াপাওয়ার বিষয়। দুটি ঈদের ক্ষেত্রে একথা প্রমাণিত। মাহে রমজান শেষে ঈদ-উল-ফিতর সম্পর্কে মহানবি (সা:)-এর বাণীর প্রতি দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা চলে যায়। কী চমৎকার সুসংবাদ রোজাদার ও ঈদ প্রত্যাশীদের জন্য। আর তা খুব স্পষ্ট। সূর্যালোকের ন্যায়। যখন নবি (সা:) বলেন, যখন ঈদ-উল-ফিতরের দিন আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যারা রোজা পালন করেছে তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ, তোমরা বলতো! যে শ্রমিক তার কাজ পুরোপুরি সম্পাদন করে তার প্রাপ্য কি হওয়া উচিত? উত্তরে ফেরেশতাগণ বললেন, হে মাবুদ! পুরোপুরি পারিশ্রমিকই তার প্রাপ্য। ফেরেশতাগণ, আমার বান্দা-বান্দিগণ তাদের প্রতি নির্দেশিত ফরজ আদায় করেছে, এমনকি দোয়া করতে করতে ঈদের (ওয়াজিব) নামাজের জন্য বের হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমার মহিমা, গরিমা, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চারণের শপথ। আমি অবশ্যই তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেব। এরপর নিজ বান্দাগণকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন, তোমরা ফিরে যাও, 'আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের সাধারণ পাপসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দিলাম। রাসূল (স.) বলেন, তখন তারা ক্ষমা প্রাপ্ত অবস্থায় (বাড়িতে) প্রত্যাবর্তন করে।'

মানুষের কল্যাণে আল্লাহ ধর্ম-কর্ম আর গ্রহাণুপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন। জীব-জগৎ, দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে তা সৃষ্টির মহা রহস্য। এর মধ্যে রয়েছে পরম শিক্ষা। আল্লাহ কখনো আনন্দ-ফুর্তি, কেনাকাটা করতে নিষেধ করেননি। খেলাধুলা, যুক্তিতর্ক, সমাজ-সামাজিকতা বৈধ। যদি নিয়ত সহি হয়, শুদ্ধ হয় তবে ঈদ-উল-ফিতরের মাঠ থেকে নিষ্পাপ মাসুম বাচ্চার মতো গৃহে ফেরা যায়। এক্ষেত্রে মহানবির বাণী রয়েছে। আমরা খুব নিবিড় মনোযোগ দিলে দেখতে পাই, ঈদ-উল-ফিতরের অনুষ্ঠানে নানা পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন যাই হোক, বিদআত না হলেই হলো। কোরান, হাদিস, ইজমা আর কিয়াসের ওপর থাকতে পারলেই হলো। যদি রোজা আর ঈদ-উল-ফিতরের সংযোগ সেতুর দিকে জ্ঞান প্রয়োগ করি তাহলে হজরত সাঈদ আনসারী (রা:)-এর কাছে ফিরে যেতে হয়। আমরা সাঈদ আনসারী-র বর্ণনা থেকে যা জানতে পারি, আমল করতে পারি তা উল্লেখ করা হলো। সাঈদ আনসারী থেকে বর্ণিত, নবি করিম (সা:) এরশাদ

করেন, ঈদুল ফিতরের দিনে আল্লাহর ফেরেশতাগণ রাস্তায় নেমে আসেন এবং পথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন,

মুসলমানগণ তোমরা আল্লাহর দিকে দ্রুত ধাবিত হও। তিনি তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইবাদাত কবুল করে অসংখ্য পুণ্য দান করে থাকেন। রোজা রাখার আদেশ করা হয়েছিল তোমাদেরকে তা তোমরা যথাযথভাবে পালন করেছ রাতেও জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদাত করেছ। অতএব যাও, তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ কর তোমাদের ইবাদাতের প্রতিদান।

আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। ঈদের সময় এমন ঘোষণা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য দেন। এ থেকে বুঝা যায় ঈদ কোনো ছোটোখাটো বা বড়ো উৎসব নয়। ঈদ মুমিনের চোখে ইবাদাত। ঈদ ও ইবাদাত যে অভিন্ন একটি প্রসঙ্গ তাও লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু উমামা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে জাগ্রত থেকে ইবাদাত করে, তার অন্তর কিয়ামতের বিভীষিকা হতে মুক্ত থাকবে।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর নিছক কোনো অনুষ্ঠান নয়। এটি আল্লাহর দিদার লাভেরও মাধ্যম। কীভাবে দিদার লাভ করা যাবে? আল্লাহর সান্নিধ্য মিলবে তা পরিষ্কার হয় মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে। এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি পাঁচটি রজনী জাগ্রত থেকে ইবাদাত করে তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়। রজনীগুলো হলো জিলহজ মাসের অষ্টম-নবম ও দশম তারিখের রাত। ঈদুল-উল-ফিতরের রাত এবং শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত অর্থাৎ শবেবরাত।

ঈদের খুশি সমাজ জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করত, জাহেলি যুগের পরে আল্লাহর রাসূল মহান রব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে যে ঈদের শুভ সূচনা করেন সেখানে ঈদ বর্ণিল হয়ে ওঠে। বহু রঙে রঙিন হয়ে ওঠে ঈদ। ঈদে নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো ভ্রমণের কোনো ঘাটতি নেই। ঈমান আমল ঠিক রেখে সব করা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) এর সময়ে আবারো ফেরা যায়। প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ঈদ বিষয়ক একটি শিক্ষা যা সকল সম্প্রদায়কে ঈদ সম্পর্কে সাহিত্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ব্যাপকতা বুঝতে ও হৃদয়ে ধারণ করতে অনুপ্রাণীত ও উজ্জীবিত করবে। কেন করবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায় হজরত আয়েশা (রা.) এর বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার সামনে তখন দুই বালিকা গান করছিল, তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। সেদিন শখ করে বুআসের দিন আনসারি সাহাবিগণ যে কাওয়ালি করেছিল, তা গাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স.) বিছানায় শুয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। এমন সময় আবু বকর (রা.) গৃহে প্রবেশ করে আমাকে ধমকাতে লাগলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের বাঁশি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আব্বাজানের উদ্দেশে বললেন, হে আবু বকর, ওদেরকে গাইতে দাও। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উৎসবের দিন থাকে। এটা হলো আমাদের উৎসবের দিন। (বুখারী, মুসলিম শরীফ) ঈদ বা আনন্দ উৎসব যাতে বিনষ্ট না হয় তার জন্য রোজা বা সিয়াম পালনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সহিহ্ বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারাও এর সত্যায়ন হয়েছে। এমন খুশি নিয়ে আরো বলা যায় রাসূলুল্লাহ (স.) বাণী থেকে। তিনি বলেন, রোজাদারদের জন্য দুটি খুশির বিষয় রয়েছে। একটি তার ফিতরের সময়, অন্যটি তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাতের সময়। এমন পুরস্কার

লাভ করতে হলে বা প্রতিদান পেতে হলে অবশ্যই সম্প্রীতির বন্ধনে কাজ করতে হবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলতে হবে। মানবিক কল্যাণে কাজ করতে হবে। রাসূলুল্লাহর (স.) শিক্ষাকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (স.) বলেন, এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীরের মতো। যার একাংশ-অপরাংশকে শক্তি যোগায়। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (স.) হাতের আঙুলগুলোকে জড়ো করে দেখান (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

ঈদ যে সকলের জন্য তা উপরোক্ত আলোচনার মতো উমরের (র.) বক্তব্য থেকেও আমাদের প্রেরণা জোগায়। ঈদ কোনো ক্ষুদ্র বিষয় নয়, কেবল অনুষ্ঠান নয়। নতুন জামা কাপড় পরিধানের জন্য নয়। এটা গরিব ও ধনীর ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। ছোটো বড়ো, রাজা-প্রজা সকলের জন্য ঈদ। তবে ঈদ হতে হলে উমর (র.)-এর বক্তব্য আগে জানতে হবে। হজরত উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাদাকাতুল ফিতরাকে অপরিহার্য ঘোষণা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তোমরা এ দিনে গরিবদেরকে স্বচ্ছল বানিয়ে দাও। (তাবরানি) 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' এ বোধ না থাকলে ঈদের আনন্দে পূর্ণতা আসবে না। ঈদ সমাজের বিভাজন দূর করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করে। ঈদ হলো সামষ্টিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। তাই ঈদ প্রসঙ্গে আয়েশা (রা.) এর ঘটনা ও কথা মোহময় করে তোলে। দায়িত্বশীল হতে শিখায়। আয়েশা (রা.) বলেন, ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে হাবশিদের কুচকাওয়াজ দেখার জন্য বায়না ধরলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হুমায়রা তোমার হাবশিদের বল্লম খেলা দেখতে ইচ্ছে করছে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে মসজিদ চত্বরে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে তার পেছনে দাঁড় করালেন। আমি তাঁর কাঁধে মাথা রাখলাম। আমার গাল তাঁর গালের সঙ্গে লেগেছিল। আমি প্রাণ ভয়ে কুচকাওয়াজ উপভোগ করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) হাবশিদের উদ্দেশে বললেন, বনি আরফাদা চালিয়ে যাও। একপর্যায়ে দেখতে দেখতে যখন আমার ক্লান্তি চলে আসলো, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, তিনি বললেন আচ্ছা, চলো তবে। (বুখারি, মুসলিম, নাসায়ি) ইসলাম ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাতে চায়।

ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব-মৈত্রী-সম্প্রীতি রক্ষা করতে চায়। সদকায়ে ফিতরের ব্যবস্থা করেছে। যা ঈদের নামাজের পূর্বে দিতে হয়। গরিব অসহায়কে সদকা প্রদান করে ইসলামি শরীয়া মান্য করতে হয়। দল-মত-পথ নির্বিশেষে সকলে যাতে উপকৃত হয় তার জন্য এ ব্যবস্থা। আল্লাহর বিধান মতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। সকলে যাতে ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার জন্য এ পদক্ষেপ। হজরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার মক্কার গলিসমূহে ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন যে, তোমরা জেনে রাখ, সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-স্ত্রী, স্বাধীন-ক্রীতদাস, ছোটো বড়ো সকলের উপর ফরজ (তিরমিজি শরীফ)।

বাস্তবতা বুঝতে হবে। মানুষের হাতের পাঁচটি আঙুল যেমন সমান নয়, তেমনিভাবে আর্থিক অবস্থাও সব লোক সমান হয় না। সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ। সদকা কেমন বা কী পরিমাণ হতে পারে? এমন প্রশ্নের মীমাংসা বিভিন্নভাবে পাই। তবে একটি হাদিস এখানে বিবৃত হলো।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) হতে বর্ণিত হাদিস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের প্রত্যেক স্বাধীন নারী, পুরুষ, ছোটো বড়ো সকলের উপর সদকায়ে ফিতর হিসেবে এক সা খেজুর অথবা এক সা যব ফরজ করেছেন এবং নামাজে বের হওয়ার পূর্বেই এটা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম শরীফ) সাদকায়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয় নিঃস্বদের ব্যাপারে। এই নিঃস্বরা সাদকা পাওয়ার হকদার। একে বঞ্চিত করা যায় না। আবু দাউদ শরীফের একটি হাদিস এখানে উদ্বৃত হলো। হাদিস বর্ণনাকারী হলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) সদকায়ে ফিতর নিঃস্বদের মুখে খাদ্য দেওয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

ঈদ নিছক কোনো আনন্দ উৎসব নয়। এর মধ্যে ইসলাম পূর্ণ রূপে রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল এর মধ্যে নিহিত। মুসলমানদের জন্য ঈদ প্রাপ্তি মহা আনন্দের। ইহা একদিকে আনন্দ স্ফূর্তির জন্য একই সময়ে ইহা ইবাদাত বন্দেগি করার জন্য। ইমান-আমল মজবুত করার জন্য।

রোজার শেষে ঈদ-উল-ফিতর। সিয়াম সাধনার দ্বারা, পরমতসহিষ্ণুতার দ্বারা রোজার পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। রোজার মাধ্যমে যারা খোদাভীতিকে গ্রহণ করেছে তারাই মূলত সম্মানিত হবে। পুরস্কার পাবে প্রতিদান লাভ করবে। রোজা বা সিয়ামের পুরস্কার আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাত দ্বারা দিবেন। একজন রোজাদার ঈদের নামাজ শেষে বাড়ি ফিরবেন নিষ্পাপ হয়ে। নিজ বাড়িতে নামাজ শেষের যে প্রত্যাবর্তন তা তাকে ইহকালে সম্মানিত করে, পরকালে দেয় আল্লাহর নৈকট্য সান্নিধ্য। নতুন চাঁদ রমজানের পরে ঈদের সুখবর নিয়ে হাজির হয়। সকল পাপ ধুয়ে দিয়ে যায়। নিষ্পাপ বানিয়ে যায়। তাইতো বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উচ্চারণে শুনতে পাই।

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ / তুই আপনাকে
আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাগিদ।

ইসলামের নির্দেশিত পথে সরকার নির্ধারিত ফিতরা আদায় করে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে দল-মত পথের উর্ধ্বে উঠে স্ব-স্ব দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য।

খান চমন-ই-এলাহি: কবি, কথাসাহিত্যিক ও অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

পানিই জীবন, জীবনই পানি

আলেয়া রহমান

বৈশ্বিক পানি ও স্যানিটেশন সংকট মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের রিও ধরিত্রী সম্মেলনে (UN Conference on Environment and Development/UNCED 'Earth Summit'– Rio) গৃহীত

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর ২২শে মার্চ এ দিনটি 'পানি দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এখানে পানি বলতে স্বাদু বা মিঠা পানি (Fresh Water) বুঝানো হয়েছে।

পানি জীবনের জন্য অপরিহার্য, তবুও পরিবেশের কারণে বা প্রাকৃতিক বা মানব-সম্পর্কিত দূষণের কারণে বিশ্বজুড়ে পানির অভাব রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, এই জীবনদানকারী সম্পদে প্রবেশাধিকারের অভাব সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। যখন পানির অভাব হয় বা তা দূষিত হয়, বা যখন সে পানিতে মানুষের মধ্যে অসম অধিকার দেখা দেয়, বা সকল পক্ষের সমান বা আদৌ প্রবেশাধিকার থাকে না, তখন সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী ১৫৩টি দেশের ৩ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করা পানির উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে শুধু ২৪টি দেশ তাদের সকল পানির হিস্যা বণ্টনে সহযোগিতার চুক্তি করেছে। যেহেতু বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই বিশ্ববাসীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ পানি রক্ষা ও সংরক্ষণে একত্রিত হওয়ার জন্য দেশ ও জাতিগুলোর মধ্যে সকল মতভেদ দূর করে জরুরিভিত্তিতে একতা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি, খাদ্য ও শক্তি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা এবং পরিবেশগত অখণ্ডতা একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী এবং সুষমভাবে পরিচালিত পানিচক্রের ওপর নির্ভর করে।

সমৃদ্ধি এবং শান্তি পানির ওপর নির্ভর করে। যেহেতু বর্তমানে বিশ্ব প্রচণ্ডভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খারাপ প্রভাব, ব্যাপক অভিবাসন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবিলা করছে, মিঠা পানির রাজনৈতিক সমাধান ও সংশ্লিষ্ট দেশ বা জাতিসমূহের মধ্যে মিঠা পানির সুষম বণ্টন চুক্তি বিশ্বকে উক্ত প্রভাব মোকাবিলায় সহযোগিতা করতে পারে।

আমাদের সংকট থেকে বের করে আনতে পারে পানি। আমরা সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে পানির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে পানির সমস্যা সমাধান করতে পারি এবং দেশগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারি। আন্তর্জাতিক স্তরে জাতিসংঘের সম্মেলন থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করতে পারি।

পানির বিষয়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের ২০২৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের ২.২ বিলিয়ন মানুষ এখনও নিরাপদ পানীয় পান করে (Drinking Water) বসবাস করে, যার মধ্যে ১১৫ মিলিয়ন মানুষ যারা ভূপৃষ্ঠের পানি পান করে।
- IPCC-এর ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বছরের অন্তত কিছু অংশে তীব্র পানি সংকটে পতিত হয়।

পানি সংগ্রহ করার পর এর লবণাক্ততা পরীক্ষা করছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের গবেষকরা

- বিশ্বব্যাংকের ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী পানি-সম্পর্কিত বিপর্যয়গুলো বিগত ৫০ বছরে দুর্যোগের তালিকায় প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত মৃত্যুর ৭০ শতাংশের জন্য দায়ী।
- জাতিসংঘের ২০২৩ সালের তথ্য মতে, বিশ্বের পানি প্রবাহের ৬০ শতাংশের আন্তঃসীমান্ত নদীর ওপর নির্ভরশীল এবং বিশ্বের ৩১০টি আন্তঃসীমান্ত নদী, হ্রদ ও অববাহিকা এবং আবিষ্কৃত ৪৬৮টি প্রাকৃতিক আন্তঃসীমান্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণাগারের মধ্যে ১৫৩টি দেশের অন্তত ১টি অঞ্চল রয়েছে, যা প্রতিবেশী দেশের সাথে পানি ভাগ করে ব্যবহারযুক্ত বা নির্ভরশীল।
- সমষ্টিগতভাবে, সারা বিশ্বে নারীদের প্রতিদিন ২০০ মিলিয়ন ঘণ্টা পানির জন্য হাঁটতে হয়।
- প্রতিবছর বৈশ্বিক কারণে পানি সংকটে ৪৪৩ মিলিয়ন স্কুল দিন মিস হয়।
- পানি সংক্রান্ত অসুস্থতার কারণে প্রতিবছর ৮২৯০০০ মানুষ মারা যায়।
- উন্নয়নশীল বিশ্বের হাসপাতালের ৫০% রোগী ভরা থাকে পানি সংক্রান্ত আক্রান্ত রোগের দ্বারা।
- বিশ্বের ৩.৬ বিলিয়ন মানুষের পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনুপস্থিত।
- পানি ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অসম্ভব। পানি পান ব্যতীত মানুষ তিন বা চার দিনের বেশি বাঁচতে পারে না। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহের ৬০% অবধি পানি।
- আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে শুধু পৃথিবীতে পানি রয়েছে বিধায় পৃথিবীতে জীবন রয়েছে। অন্যান্য গ্রহে পানি নেই; তাই অন্য গ্রহে কোনো জীবনও নেই।

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পানি অপরিহার্য। পানি ব্যতীত আমরা এক মুহূর্তে চলতে পারি না। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণে প্রয়োজন পানির। পানিই জীবন, জীবনই পানি।

আলেয়া রহমান: প্রাবন্ধিক

দূষণ রোধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৮ কোটি টাকার বেশি জরিমানা আদায়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ নির্দেশনায় বায়ু ও শব্দ দূষণ, নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন ও সরবরাহ, অবৈধ ইটভাটা, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য নির্গমন-সহ বিভিন্ন দূষণকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কঠোর অভিযান চালিয়েছে। ২রা জানুয়ারি থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে ৫২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১ হাজার ২৪৫টি মামলা করা হয় এবং ১৮ কোটি ৩২ লাখ ৫৩ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানে ২৪৯টি অবৈধ ইটভাটার চিমনি ভেঙে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। ১৩৫টি ইটভাটা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়, ৩৫টি ইটভাটার কাঁচা ইট ধ্বংস করা হয় এবং পাঁচটি প্রতিষ্ঠান থেকে ছয়টি ট্রাকভর্তি সীসা/ব্যাটারি গলানোর যন্ত্রপাতি জব্দ করে কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও দণ্ডবিধি অনুযায়ী মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জানান, দূষণ রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ

জান্নাতুল ফেরদৌস

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে আয়তনে ছোটো হওয়া সত্ত্বেও বন্যপ্রাণীর এমন প্রাচুর্য এদেশের সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যকে করেছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খলের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি বন সৃজনে বন্যপ্রাণী মূল ভুমিকা পালন করে। বর্তমানে দেশের বেশকিছু বন্যপ্রাণী বিলুপ্তির ঝুঁকিতে আছে। বিলুপ্তপ্রায় এসব প্রাণীদের সংরক্ষণে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৩রা মার্চ পালিত হয় 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস'।

৩রা মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বন ভবনে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত হয় আলোচনা অনুষ্ঠানের। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল: 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অর্থায়ন, মানুষ ও ধরিত্রীর উন্নয়ন'। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমরা ময়ূর পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি। সাফারি পার্কে ময়ূর অবমুক্ত করা হয়েছে এবং প্রকৃতিতেও তাদের ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। মধুপুর শালবনে নতুন করে ১৫০ একর এলাকায় প্রকৃতিবান্ধব বনায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য আমাদের গর্বের বিষয়, কিন্তু একই সঙ্গে এটি নানা হুমকির মুখে রয়েছে। তবে আশার বিষয়, ইতিবাচক অনেক পরিবর্তনও ঘটছে। একটি সুসংবাদ দিতে চাই, আমাদের বন অধিদপ্তরের জন্য নতুন ৩৬০টি পদের অনুমোদন দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এটি আমাদের বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষার প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে। উপদেষ্টা সুন্দরবনে অগ্নিকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আগুনের পুনরাবৃত্তি রোধে আমাদের আরও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ৩রা মার্চ ঢাকার আগারগাঁওস্থ বন ভবনে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় জনসচেতনতা বাড়ানো জরুরি। আমরা চাই, চিড়িয়াখানাগুলো প্রাণীদের জন্য আরও উন্নত বাসস্থান হোক। সাফারি পার্কগুলোর কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রাণীগুলো মুক্ত পরিবেশে চলাফেরা করতে পারে। পাশাপাশি, সাফারি পার্কগুলোর চিকিৎসা সুবিধা বাড়াতে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। উপদেষ্টা বলেন, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হাতির করিডোর তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, আগামী মাস থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হবে। তিনি আরও জানান, এ বছর আমরা বহু মেছোবিড়াল উদ্ধার করেছি এবং দেশে প্রথমবারের মতো 'মেছোবিড়াল দিবস' পালন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা কেবল বন্যপ্রাণী ফিরিয়ে আনাই নয়, তাদের জন্য নিরাপদ আবাসস্থলও নিশ্চিত করতে চাই। প্রকৃতি, বন এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণই আমাদের মূল শক্তি।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা 'এসো চিনি বন্যপ্রাণী' এবং 'ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি' প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে বিশেষজ্ঞগণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্যপ্রাণী বিষয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জান্নাতুল ফেরদৌস: প্রাবন্ধিক

গাছ সুরক্ষায় মাসব্যাপী গাছ থেকে পেরেক অপসারণ কর্মসূচি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। গাছ ও পরিবেশের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টিতে সকলের ভূমিকা রাখতে হবে। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া গাছ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি থেকে দেশব্যাপী গাছ সংরক্ষণে বন অধিদপ্তরের উদ্যোগে গাছ থেকে পেরেক অপসারণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সারাদেশ জুড়ে প্রতিটি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ এক মাসব্যাপী এ কর্মসূচি চলবে।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

ভোক্তা অধিকার আদায়ে জরুরি সচেতনতা

সাবিহা সুলতানা

ভোগ শব্দ থেকে ভোক্তার উৎপত্তি। যিনি মূল্যের বিনিময়ে কোনো ভোগ্যপণ্য বা সেবা ক্রয় করেন তিনিই ভোক্তা। বিশ্বের সকল ভোক্তার ৮টি অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। এগুলো হলো– ১। মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার ২। তথ্য পাওয়ার অধিকার ৩। নিরাপদ পণ্য বা সেবা পাওয়ার অধিকার ৪। পছন্দের অধিকার ৫। জানার অধিকার ৬। অভিযোগ করা ও প্রতিকার পাওয়ার অধিকার ৭। ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভের অধিকার ৮। সুস্থ পরিবেশের অধিকার । একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্বশীল পদক্ষেপ ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৫ই মার্চ পালিত হয় 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস'। ১৯৮৩ সাল থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৫ই মার্চ ১৯৬২ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কংগ্রেসে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। নিরাপত্তার অধিকার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, পছন্দের অধিকার এবং অভিযোগ প্রদানের অধিকার– ভোক্তাদের এ চারটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন, যা পরবর্তীতে ভোক্তা অধিকার আইন নামে পরিচিতি পায়।

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের মাধ্যমে জাতিসংঘ ভোক্তা অধিকার রক্ষার নীতিমালায় কেনেডি বর্ণিত চারটি মৌলিক অধিকারকে আরও বিস্তৃত করে অতিরিক্ত আরও আটটি মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করা হয়। এরপর থেকেই কনজুমার্স ইন্টারন্যাশনাল এ সকল অধিকারকে সনদে অন্তর্ভুক্ত করে। কেনেডির ভাষণের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৫ই মার্চকে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস হিসেবে বৈশ্বিকভাবে উদ্‌যাপন করে আসছে।

ভোক্তা অধিকার মানবাধিকারেরই নামান্তর। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সমাজের উচ্চতর হতে প্রান্তিক পর্যায়ের সকল মানুষই ভোক্তা। আর বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ভোক্তাকে তার অর্জিত অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলেই দেশের ইকোনমি হবে শক্তিশালী। আর দেশের ইকোনমি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং শোষণমুক্ত জাতি গঠনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য হচ্ছে ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯-এর

কার্যকর বাস্তবায়নে ভোক্তা অধিকারবিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ করা। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজার তদারকির

মাধ্যমে ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণ; ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা ও সংরক্ষণ করতে 'ভোক্তাঅধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' প্রণীত হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো মূলত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ভোক্তাঅধিকারবিরোধী কার্য প্রতিরোধ, ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনজনিত বিরোধ নিষ্পত্তি, নিরাপদ পণ্য ও সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তাকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, পণ্য ও সেবা ক্রয়ে প্রতারণা রোধ এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯'-এ শুধু ভোক্তাকে সুরক্ষিত করা হয়নি; একইসঙ্গে সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীদেরকেও সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। ভোক্তা কর্তৃক মিথ্যা ও হয়রানিমূলক অভিযোগ দাখিল করার জন্য শাস্তির [৩ বছরের জেল বা অনূর্ধ্ব ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) জরিমানা বা উভয় দণ্ডের] বিধান রয়েছে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ একদিকে যেমন ভোক্তাবান্ধব অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়ীবান্ধবও বটে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ভোক্তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সচেতন ও সহযোগিতাপ্রবণ ভোক্তাই একটি সুস্থ বাজার ব্যবস্থা তৈরিতে প্রধান নিয়ামক। চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে আকৃষ্ট না হয়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়ের পূর্বে দেখে-শুনে-বুঝে ক্রয় করা একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল ভোক্তার পরিচয়। ভোক্তা সাধারণ ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জানার পাশাপাশি ভোক্তা অধিকারবিরোধী কার্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও সোচ্চার হলে এবং অভিযোগের মাধ্যমে প্রতিকার প্রত্যাশী হলে এ আইনের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

সাবিহা সুলতানা: প্রাবন্ধিক

পূর্বাচলে ১৪৪ একর বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা ঘোষণা

রাজধানীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পূর্বাচলে ১৪৪ একর এলাকা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সম্প্রতি এটিকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। গবেষকেরা বলছেন, ঢাকায় বাস করছে ২০৯ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। উদ্যানের মগডালে টিয়া-ভূবন চিল, জলে ডলফিন আর আর স্থলে এখনও টিকে আছে বানর, বাদুড়, গুঁইসাপ। তবে উভচর, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রায় সব প্রাণীই আছে অস্তিত্ব সংকটে। চন্দনা, হিরামন, টিয়ার দেখা হরহামেশাই মেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। চন্দ্রিমা উদ্যান, রমনা পার্কের উঁচু গাছে এমন টিয়া আছে চার প্রজাতির। আর ভুবন চিলের বাস কেন্দ্রীয় শহিদমিনার প্রাঙ্গণের শিরিশ গাছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. ফিরোজ জামান বলেন, মহানগরীতে শত সংকটেও টিকে আছে কেশরী ফিঙ্গে, ছোটো ভীমরাজ, হরিয়াল, বসন্ত বাউরি। শীতে অন্তত ৪০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আসে এই শহরে, স্থায়ী বাসিন্দা ১৬২ প্রজাতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের জরিপ বলছে, রাজধানীর রমনা, উত্তরা, পূর্বাচল, দিয়াবাড়ি, খিলক্ষেত, আফতাবনগরসহ রাজধানীর ২২ এলাকায় রয়েছে বন্যপ্রাণী। ১৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ীর মধ্যে আছে কৃষকের বন্ধু বনবিড়াল। নগরে এখনও বানর, শেয়ালের চলাচল আছে। তবে এদের সংখ্যা কমছে প্রতিবছরই। আছে গুঁই সাপ, খৈয়া গোখরা, পদ্ম গোখরা, তক্ষকের মতো ১৯ প্রজাতির সরীসৃপ। রাজধানীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সম্প্রতি পূর্বাচলে ১৪৪ একর জায়গা বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী শ্যামা

হে বৃক্ষ

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

গ্রামটি ভারি সুন্দর। নামটিও দারুণ চমৎকার, পদ্মদিঘি। যে দেখে সেই বলে, ভারি সুন্দর গাঁ তো। গাছগাছালিতে ছাওয়া নীরব-নিঝুম।

মিয়া বাড়িই এ গাঁয়ের সম্পন্ন মানুষ। বিরাট জায়গাজুড়ে পাকা বাড়ি। বাড়ির একদিকে ফলের বাগান, ফুলের বাগান। এছাড়াও হিজল, বটগাছের সারি। পথিকরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। গাঁয়ের ছেলেরা ছোটাছুটি করে। গোল্লাছুট খেলে। গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ বিকালে গাছের ছায়ায় সবাই গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দেয়।

ছাতার মতো ঝুপসি বটগাছটিই এ বাড়ির সবচেয়ে পুরানো গাছ। মিয়াদের কোনো পূর্বপুরুষ এ গাছটি লাগিয়েছিলেন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে বসে সারাদিন মিষ্টি সুরে পাখি ডাকে, দখিনা হাওয়া ঝিরিঝিরি বয়ে যায়।

মানুষরা কেউ শুনতে পায় না, অথচ গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। একরত্তি লজ্জাবতী লতাটি বলে– কি গো দাদু, ভালো আছো?

বটগাছটির চোখেমুখে সবসময় মিষ্টি হাসি। ভালো, খু-উ-ব ভালো। বাড়ির লোকেরা মাঝে মাঝে খুব জ্বালাতন করে। বড়ো বড়ো ডাল ছেঁটে দেয়। গাঁয়ের ছেলেরা বটফল পেড়ে খেলা করে। দুহাত দিয়ে কচি ডাল-পাতা ছিঁড়ে বড়ো ব্যথা দেয়।

বটগাছটি এক এক সময় চিৎকার করে উঠতে চায়। বলতে চায়– তোমরা কি জানো না, গাছেরও প্রাণ আছে? কেন তোমরা এমন করে আমাদের কষ্ট দাও?

মেঠোপথ বেয়ে ঐ তো তিনটি কিশোর গল্প করতে করতে আসছে। কচি কচি মুখ। ওমা– এর মাঝে হলো কি, একটি কিশোর গুলতি দিয়ে সাঁই করে মারল বটগাছটির ডালে। চুপচাপ বসে থাকা শালিকটি ছিটকে পড়ে নীচে।

পাখিটি ওর ছোটো ছোটো পাখা ঝাপটায় আর ছটফট করে। ছুটে আসে তিনটি কিশোর। দুটি ছেলে পাখিটির রক্তমাখা শরীর নিয়ে কী যেন আনন্দ করে! কিন্তু গোল মতো মুখের ছেলেটি বলে, শুধু শুধু মারলে কেন ওকে?

বটগাছটির মনের কথা যেন ছেলেটি বলে, অন্য ছেলেটি ওর থুতনি ধরে বলে– পাখিটির জন্য তোর খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই না রে রাজা?

বটগাছটি দেখে, ছেলেটির চোখে টলটলে জল। বলে– জানি না।

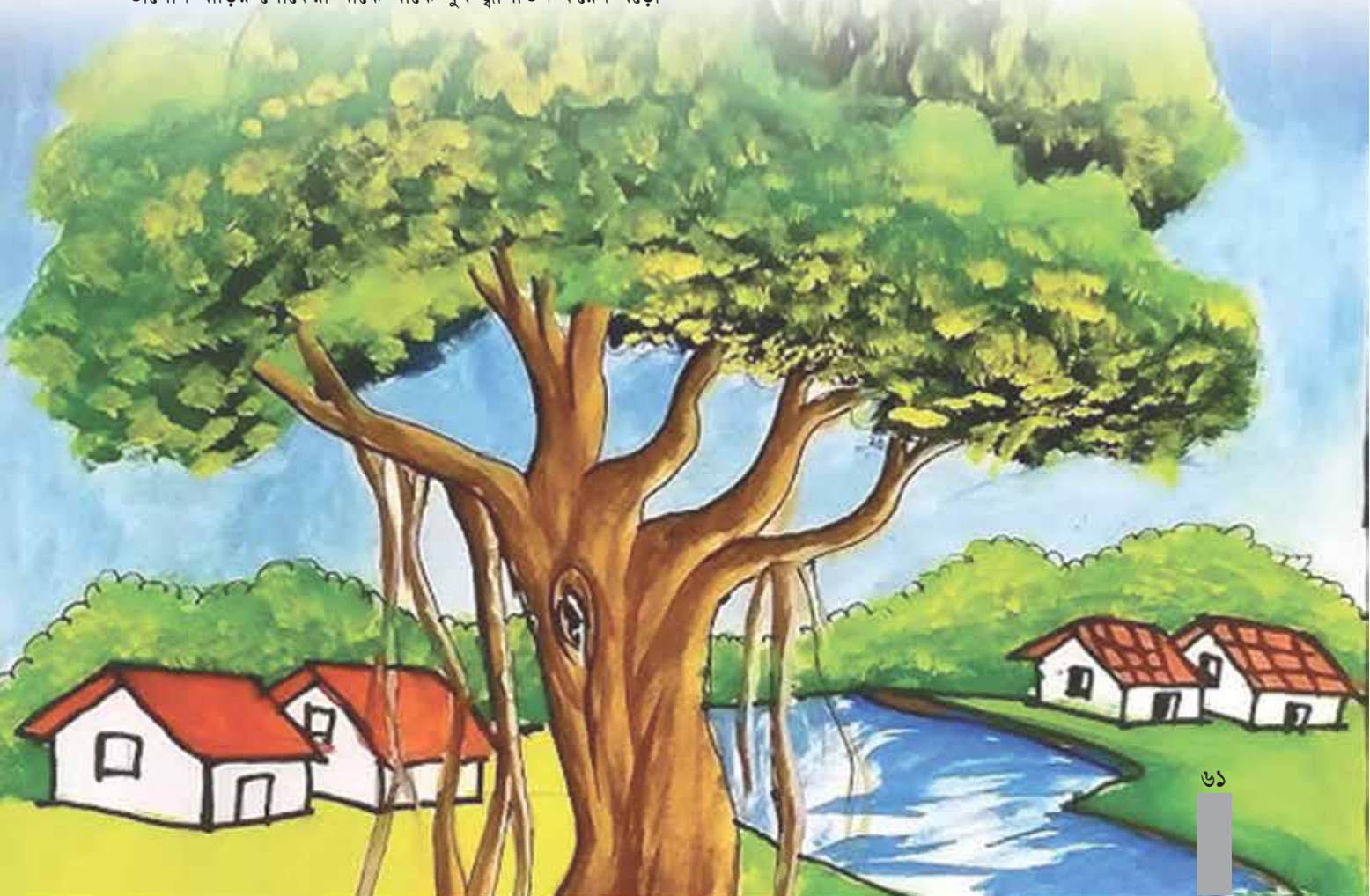

ওরা চলে গেলে পরেও বটগাছটি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর এক দঙ্গল দুষ্টু ছেলে কটি ছাগলকে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়াতে

থাকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলে বলে, আহা রবীন, কী করো, খামোখা ঢিল ছুঁড়ছ কেন?

রবীন নামের ছেলেটি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, হয়েছে, হয়েছে– তোকে আর গুডবয়গিরি দেখাতে হবে না। তুই তো বুঝিস না, ঢিল ছুঁড়লে ছাগলের বাচ্চাগুলো যে তিড়িংবিড়িং করে লাফায় দেখতে দারুণ মজা– তাই নারে রন্টু?

অন্যসব ছেলেদের কাছে এ এক মজার খেলা। কী আনন্দই না ওদের।

আসলে এ পৃথিবীতে মানুষরা শুধু হানাহানি-মারামারি করে, ভালোবাসা মমতা বলে কিছু নেই।

কী অদ্ভুত জীব এই মানুষ!

বটগাছটি নিশ্বাস ফেলে। অথচ এসব না করে ওরা তো কত ভালো কাজও করতে পারত। দুষ্টু ছেলেগুলো যখন গাছে চড়ে বটফল ছিঁড়তে থাকে, একটার পর একটা ডালপালা ভাঙে, পাতাগুলো অযথা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে তখন বটগাছটির বুক ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়।

ঐ যে লজ্জাবতী লতা, হিজল, কদম ওরা সব কিছু কী সহজে মেনে নিয়েছে। তাই কোনো দুঃখকষ্ট ওদের নেই। কিন্তু বটগাছটির মন অন্যরকম। ওর যে সবাইকে শুধু ভালোবাসতেই ইচ্ছে করে।

তাই তো সে এক এক সময় বলে ওঠে, এই পৃথিবীতে কেন আরও জগদীশ চন্দ্র বসু জন্মায় না? তাহলে তো ওরা গাছের যে প্রাণ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ আছে, এসব জানতে পারত।

বটগাছের মনে হয়, একদিন সবাই মরে যাব, ঝরে যাব– এ পৃথিবীতে তো কেউ চিরকাল থাকে না– তা হলে আমরা সবাই কেন ভালো কাজ করে যাব না।

গাছটির মনে চমৎকার এই বোধের বীজটির জন্ম দিয়েছেন এ গাঁয়েরই একজন মানুষ– স্কুলের ফরিদ মাস্টার। ফরিদ মাস্টারের কথাগুলো ভারি চমৎকার। ওর সব কথাই প্রাণে গেঁথে রাখার মতো।

একবার মিয়া বাড়ির কাজের ছেলে আম গাছের ডাল কাটছিল।

ফরিদ মাস্টার কাজের লোকটিকে বলেছেন, এই ব্যাটা, তোকে কেউ মারলে তুই ব্যথা পাস না?
– পাই তো।
– পাই তো, পাস যদি ব্যাটা তবে গাছের ডাল কাটছিস কেন?
দুপাটি দাঁত বের করে রহিম হেসে বলেছে, মানুষ আর গাছ এক হইল? পাগল মাস্টারের কথা হুনো।

– হাঁ রে মূর্খ। একই হইল– মানুষে ব্যথা পায়, গাছও ব্যথা পায়।

রহমত হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে গাছে। বলে, একখানা হাসির কথা হুনলাম আইজ।

মিয়া বাড়ির মেজ ছেলে ফরিদ মাস্টারের ছাত্র। ওকে ডেকে মাস্টার বলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'নাটিং' কবিতাটি পড়নি তানভীর? মনে আছে কবিতাটি? কবিতায় কিশোরটি বলেছে, গাছগাছালিকে আদর করে স্পর্শ করো। ওদের আঘাত করো না। গাছেরও তো প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখ আছে। সেও মানুষের মতো ব্যথা পায়।

মাস্টারের কান্নাভরা কথাগুলো শুনতে শুনতে বটগাছটির পাতায় পাতায় অনেক কান্নার ফোঁটা জমেছে। আগে গাছটি এত সব ভাবত না। জানতও না। ফরিদ মাস্টারই পাথরে খোদাই করার মতো চমৎকার কথাই না শুনিয়েছেন।

শেষ দুপুরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দুষ্টু ছেলেরা ডাংগুলি খেলে হৈ চৈ করে, মারামারি করে। ফরিদ মাস্টার একদিন বলেন, আহারে মিছেমিছে কেন সময় নষ্ট করিস? একটা কিছু কর। ঐ মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি করে কোনো লাভ আছে?

সময় বহিয়া যায় স্রোতের মতন
এখন-তখন নাই চলে অনুখন।
আজি যে সময় গত হইল তোমার
আসিবে না আসিবে না আসিবে না আর।

গাঁয়ের সবচেয়ে পাজি ছেলে রন্টু, মাস্টারের চোখ বাঁচিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, সময় ফিইর‍্যা না আইলে কী হইব স্যার?

– কী হইব? ভালো কাম করার সময় কইম্যা যাইব। মাস্টার সাহেব তার নিজের কথার ভঙ্গিতে ফিরে যান।

– তাই সবসময় ভালো কাজ করার চেষ্টা করবি। জীবন তো একটাই! এ জীবনটা হেলায় কাটাবি না। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে ভাববি কটা ভালো কাজ তুই করেছিস।

– স্যার খালি ভালো কামই করুম? খেলুম না?
আহা খেলবি না কেন? এ কবিতাটি জানিস না,

পড়ার সময় পড়ে যারা
খেলার সময় খেলে
আমরা তাদের ভালবাসি
আমরা তাদের দলে।

মাস্টারের কথাগুলো ভারি পছন্দ হয়েছে বটগাছটির। এত পছন্দ হয় যে, ওর পাতাগুলো ঝিরিঝিরি করে নেচে ওঠে। আসলেই তো আমরা সবাই একদিন মরে যাব, ঝরে যাব– তাহলে কেন ভালো কাজ করব না?

ফরিদ মাস্টারের কথাগুলো মনের মাঝে নাড়াচাড়া করে করেই

বটগাছটি কাটিয়ে দেয় নীল নীল সকাল, হলুদ রং দুপুর আর রুপালি রাত।

কিছুদিন থেকে যে কী হয়েছে– গাঁয়ের সবাই যেন ভয়ে ভয়ে আছে। দৈত্যের মতো হুঁসহুঁস করে জলপাই রঙের গাড়ি ছুটে আসে, বুট পায়ে নতুন নতুন সব মানুষ। গাঁয়ের মানুষ বলাবলি করে– মিলিটারি আইছে। সৈন্য আইছে।

গাছটি অবাক হয়ে ভাবে, এত বলাবলির কী আছে? মানুষ মানুষকে ভয় পাবে কেন?

গাঁয়ের মানুষরা দারুণ ভয় পেয়ে যায়। পাকিস্তানের সৈন্যগুলো নাকি ভারি নিষ্ঠুর। মানুষ মেরেই নাকি ওদের আনন্দ।

কচি কচি ছেলেমেয়েরা এখন আর ডাংগুলি খেলে না। পুকুর ঘাটে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আর ডুব-সাঁতার দেয় না, শাপলা তোলে না, হুটোপুটি করে না। পদ্মদিঘি নীরব হয়ে গেছে!

মিয়াবাড়িতে এখন আর কেউ নেই। ফরিদ মাস্টারকেও এখন আর দেখা যায় না। কোলের বাচ্চারা কাঁদতে ভুলে গেছে।

গাঁ থেকে মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। যে মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল সে ঝিনুক বাটি নিয়ে ছুটছে, যে ভাত খাচ্ছিল সে এঁটো হাতেই দৌড়োয়। ভয়ে সবার মুখ সাদাটে। একবিন্দু রক্তও কারও মুখে নেই। বটগাছটির মন খারাপ হয়ে যায়। লজ্জাবতী লতা বলে– তুমি সবার কথা ভাব, তাই মন খারাপ লাগছে তোমার। মানুষরা গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাতে আমাদের কী?

লজ্জাবতীর কথা শুনে বটগাছটির হাসি পায়। ও তো জানে না, মানুষ না থাকলে কোনো কিছুতেই প্রাণ থাকবে না।

বিরান হয়ে যাচ্ছে সমস্ত গাঁ। মেঠোপথে কেউ আর যখন তখন হেঁটে যাওয়া-আসা করে না। হাট থেকে সওদা নিয়ে চাঁদনি রাতে গাঁয়ের মানুষ আর ফেরে না। বটগাছটি অনুভব করে, সে বড়ো একা হয়ে গেছে। পাখিরা গাছের শাখায় বসে গান গায় না। মানুষজন নেই বলে কুটুম পাখি আর ডেকে ফিরে না। শিশু নেই বলে রং বেরঙের ফড়িং আর প্রজাপতি অভিমানে আসে না।

বাতাসে বারুদের গন্ধ। হাওয়ায় শুধু রক্তের ঘ্রাণ ভাসে। তরতর করে বয়ে যাওয়া নদীতে মৃত মানুষ ভেসে ভেসে যায়।

পদ্মদিঘি গাঁয়ে যখন তখন বন্দুকের গুলির আওয়াজ। সৈন্যদের সে কী উল্লাস! পিঠে বন্দুক ফেলে বুটের আওয়াজ তুলে দানবের মতো সারা পদ্মদিঘি টহল দিয়ে ফেরে। রুগ্ন-ভীরু মানুষদের ওরা ধরে এনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেয়। ওদের করুণ স্বরের চিৎকার শুনতে শুনতে বটগাছটির বুকের ভেতর হিমেল নদী বয়ে যায়।
ওরা বলে, বাতাও– মুক্তি ফৌজ কিধার?
কেঁদে কেঁদে ওরা বলে, জানি না হুজুর, জানি না।

– ঝুট বাত। লালচে-মুখ বন্দুক ঠুকে মাটিতে, পিশাচের মতো লোকগুলো বলে– আরে ইয়ার, দের কিউ? আভি খতম করদো না গাদ্দার লোগোকো। বটগাছটির বুক ধুক্‌ধুক্‌ করে।
মৃত্যুর কথা বলে ওরা? ওদের হৃদপিণ্ড কি পাথরের? কই ফরিদ মাস্টার তো কখনো এমন শক্ত কথা বলেনি।
একটানা গুলি বেরোয় বন্দুক থেকে। বেয়নেটের খোঁচায় রক্ত ঝরে। পাখিরা একসঙ্গে উড়ে পালায়। দূর থেকে কুকুরের করুণ কান্না ভেসে আসে। পানা পুকুরে সারা শরীর ডুবিয়ে কচুরিপানার

মাঝে মানুষ প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাকে। রক্ত আর লাশ দেখে ওরা ঠা ঠা করে হাসে।

রাক্ষুসে মানুষদের হাসি শুনে বটগাছটির ডালপালা থরথর করে কাঁপতে থাকে। গাঁয়ে রাত জাগা বৌ-ঝিদের চিঁড়ে কোটার আওয়াজ হয় না কেন? রিমিঝিমি চুড়ির শব্দ তোলে ওরা আর কলস ভরবে না? দুষ্টু ছেলেগুলো আর কোনোদিন গাঁয়ে ফিরে আসবে না ডাংগুলি খেলতে?
বটগাছটি কান পেতে থাকে। ইস, একবার যদি মিয়া বাড়ির ছোট্ট মেয়ে খুশবুর ভুলভাল ছড়া ভেসে আসত—
'পানপাতা মুখ মা যে আমার আলগা খোঁপা বান্ধে।'
এসব ভেবে ভেবে দুপুর কেটে যায়। এক সময় বিষণ্ন বিকাল নেমে আসে।

সন্ধ্যার মুখে চুপিচুপি মিয়া বাড়ির ভেতরে এসে কজন ঢুকে। হাতে অস্ত্র। মুখগুলো খুব চেনা মনে হয়। মাথায় লম্বা ঘোমটা দিয়ে কে যেন ওদেরকে ভাত দিয়ে যায়। বহুদিন পর পেটপুরে ওরা ভাত খায়। নিজেদের মাঝে কথা বলে।

ওরাই বুঝি মুক্তিযোদ্ধা? ওদের খুঁজে খুঁজেই বুঝি হয়রান হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যগুলো?

ফরিদ মাস্টারের কথা মনে পড়ে।

জীবন তো একটাই। ছোট্ট জীবনকে বৃথা যেতে দিও না। একজন অন্ধকে যদি রাস্তা পার করে দাও, একজন ভিখারিকে যদি খেতে দাও, সেটাও একটা ভালো কাজ।

বটগাছটির ডালপালা আনন্দে শিহরিত হতে থাকে। তোমরা জীবনটাকে বৃথা যেতে দাওনি। দেশকে স্বাধীন করবার মহৎ কাজে তোমরা নেমেছ। জয় তোমাদের হবেই।

ওরা বোধ হয় খেয়ে-দেয়ে মিয়া বাড়ির দাওয়ায় ঘুমিয়েছে। আহা বড়ো ক্লান্ত। ঘুমোক ওরা। এক সময় রাত গাঢ় হয়। আকাশে শুক্লা চাঁদ। বিরান পদ্মদিঘি। চাঁদের আলোয় সবকিছু ডুবে আছে। গাছগাছালির পাতায় পাতায় ঘুমের ছোঁয়া।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। একসঙ্গে ক'জোড়া বুটের ছন্দময় শব্দ। ঐ বুঝি আসছে পিশাচের দল। বন্দুক এলএমজি স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় চকচক করে। গাছের শাখায় পাখিরা ভয়ে ডানা ঝাপটায়।

ওরা নিজেদের মাঝে কথা বলে,

কাঁহা হে মুক্তিফৌজ, কিধার হে কমবখত? আরে ঝুট ইনফরমেশন দিয়া?

তবে কি ওদেরকে ধরতে এসেছে ওরা? কেউ না কেউ ওদের খবর দিয়েছে। এক্ষুণি তো গোটা মিয়া বাড়ি ওরা তছনছ করে ফেলবে। কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গাছটির বুকের ভিতর উথালপাথাল করে। বটগাছ তো সারাজীবন মানুষকে ছায়া দেয়, আশ্রয় দেয়, কিন্তু আজ সে নির্মম হয়ে ওঠে। অনুভব করে, তার বুকের মাঝে দেশের জন্য গভীর এক মমতার জন্ম হয়েছে।

বটগাছটির নীচে দানবগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক শিকারির মতো ওৎ পেতে আছে। ওদেরকে পেলেই জাপটে ধরবে। বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় রক্তাক্ত করে তুলবে। ঠা ঠা পৈশাচিক হাসিতে নিঝুম রাতের প্রহরকে খান খান করে দেবে।

কিন্তু তা কি হতে দিতে পারে গাছটি?

শিকড় থেকে ডাল-পাতা ব্যথায়, কষ্টে কঁকিয়ে ওঠে। বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে কত বছর ধরে মাটির পরতে পরতে শিকড়গুলো মিশে আছে। আজ সে ক্রোধে ক্রোধে দানব হয়ে যায়। হারকিউলিসের মতো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ওদের ওপর। এক সময় গাছটির বুকের ভেতর হারকিউলিসের মতো প্রচণ্ড এক জীবনশক্তি টগবগ করে। শিকড়ের বাঁধন থেকে মাটির ক্ষমতাকে সে অনায়াসেই খুলে নেয়। নীরব রাতকে খান খান করে ফিকে চাঁদের আলোতে প্রচণ্ড এক আওয়াজ করে বটগাছটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের বুক ফাটা আর্তনাদ মিশে একাকার হয়ে যায়। সে শব্দে বনেবাদাড়ে, ঘরের কোনায় লুকিয়ে থাকা অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধারা ছুটে আসে। অবাক হয়ে সবাই দেখে, প্রকাণ্ড সেই গাছের নীচে রক্তাক্ত একদল পাক সৈন্যদের লাশ।

হঠাৎ কী করে গাছটি পড়ল? অবাক কাণ্ড তো! ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, শিকড়ও আলাদা হয়নি, আগাছাও হয়নি। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। গাঁয়ের কারও ওপর পড়েনি, আমাদের ওপরও পড়েনি– ঠিক হানাদারদের ওপর পড়েছে– দ্যাখো কেমন মজার কাণ্ড।

একজন, নিশ্বাস ফেলে বলে, বটগাছটিকে মুক্তিযোদ্ধা বলতে হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ওর নামও লেখা থাকবে।

চাঁদ ডোবা রাতের হিম হিম হাওয়ায় শেষ নিশ্বাস নিতে নিতে বটগাছটি আপন মনে বলে, স্যার– আমি আপনার কথা শুনেছি, একটি অন্তত ভালো কাজ করে আপনাদের শরিক হয়েছি। জীবন একটাই। কারও না কারও উপকারে লাগার জন্যই তো জীবন।

দূর থেকে দামাল মুক্তিযোদ্ধার দল ছুটে আসছে উল্লাস করে। সবাই অবাক হয়ে দেখে কদম গাছের মতো যে গাছটি ফুল ফুটিয়ে বাতাস সুগন্ধি করে তুলেনি, কৃষ্ণচূড়ার মতো লাল হয়ে ওঠেনি, সেই বহু পুরানো তামাটে বটগাছটি নিজের জীবনের বিনিময়ে একটি মহৎ কাজ করে সবার চেয়ে সুন্দর, সবার চেয়ে মহৎ হয়ে উঠেছে। গাছের পাতায় পাতায় অনেক অনেক কান্নার ফোঁটা। সকাল হলে সবাই দেখে ভাববে, পাতায় পাতায় কত শিশিরের ফোঁটা। কিন্তু কেউ জানবে না, এগুলো শিশিরবিন্দু নয়– এ বটগাছটির সুখের কান্না।

তামাটে বটগাছটি আনন্দে-সুখে বলে চলে, 'আজ আমি ধন্য, আমি ধন্য।'

———— ○ ————

একাত্তরের আগন্তুক

সুজন বড়ুয়া

সন্ধ্যার সময় আমরা পড়তে বসেছিলাম। দাদা, দিদি আর আমি। আসলে নামমাত্র পড়া, দেশের সব স্কুল-কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। এ সময় লেখাপড়ায় এত গরজ কার! তবু এতদিনকার অভ্যাস, তাই রুটিন মাফিক সন্ধ্যা হলেই আমরা টেবিলে বসি, গল্প করে সময় কাটাই। দাদাই তার কোনো বই থেকে আমাদের গল্প পড়ে শোনায়। দাদা ক্লাস টেনে পড়ে। দিদি সেভেনে আর আমি সিক্সে।

ঘরের পুবদিকের বারান্দার দক্ষিণ কোনায় আমাদের পড়ার টেবিল। বারান্দার সঙ্গেই সদর দরজা। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। আমাদের সামনে টেবিলে হ্যারিকেন জ্বলছে। দাদা আমাদের আজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্তের গল্প পড়ে শোনাচ্ছে। আমরা গভীর মনোযোগে শুনছি।

বারান্দার সদর দরজায় হঠাৎ টোকা পড়ার শব্দ। সেইসঙ্গে বাবার পরিচিত গলা খাঁকারি। বাজার থেকে বাবা ফিরে এসেছেন। প্রতিদিন এভাবেই আসেন বাবা। আমরা ঘরের দরজা খুলে দেই।

আজ দরজা খুলে আমরা অবাক। বাবা একা নন। তার পেছনে অচেনা একজন দাঁড়িয়ে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক তরুণ। মাঝারি উচ্চতা, গাবদা-গোবদা মজবুত শরীর, কালচে গায়ের রং। মাথায় খাড়া খাড়া ছোটো চুল, আর্মি ছাঁট দেওয়া। পরনে হাফ শার্ট আর লুঙ্গি। ফ্যাকাসে মুখে ঘরে ঢুকল ছেলেটি।

আজকাল মানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে রাতের বেলা এমন দুএকজন অতিথি আসে আমাদের বাড়িতে। মাস দুয়েক আগেও দুজন এসেছিল। ওরা ছিল দুভাই, হিন্দু ধর্মাবলম্বী, অনিল আর সুনীল। ভারতে চলে যাওয়ার উদ্দেশে এসেছিল তারা। সারাদেশের হিন্দুরা যখন ভারতমুখী, বাবামাসহ পুরো পরিবারকে তারা পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই সময়। ঘরবাড়ির মায়ায় দেশে থেকে যেতে চেয়েছিল এই দুভাই। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটেছে ভারতের দিকে। কিন্তু এরই মধ্যে পথ হয়ে উঠেছে বড়ো বিপৎসংকুল। দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সশস্ত্র হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তাদের সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে দেশীয় শান্তি কমিটি-রাজাকার এসব লোকজন। তাই এখন পাড়া-গ্রাম ঘুরে বহু খোঁজখবর নিয়ে সঙ্গী-সাথি ধরে পথ পাড়ি দিতে হয় ভারতে। আমাদের দক্ষিণ দিককার থানা হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গুনীয়া, বোয়ালখালী এসব এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এ পথে আসে প্রধানত। ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে কত লোক যে এ পথে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রথমদিকে প্রতিদিনই স্রোতের মতো লোক আসত দলে দলে। ধীরে ধীরে কমে গেল, এখন কদাচিৎ আসে দুএকজন। আমাদের বিবিরহাট বাজারে এসে এসব

আগন্তুক নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে কীভাবে যেন তারা বাবার কাছে এসে পড়ে। বাবা একদিন বলেছিলেন,

'ধর্মীয় পরিচয়টা এখন বড়ো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র। অন্যদিকে চীন বৌদ্ধ-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে এবং বাংলাদেশের নবগঠিত প্রবাসী সরকার ভারতে বসে কাজ করছে। এজন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের চোখে এ দেশের হিন্দুরা এখন চরম শত্রু; দেশ ছেড়ে পালাতে হচ্ছে তাদের। আর অন্যদিকে চীন এ যুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে পাকিস্তানকে। তাই আমাদের তেমন সমস্যা নেই। কারণ আমরা বৌদ্ধ, চায়না বুদ্ধিস্ট।' এ কারণে ভারতগমনপ্রত্যাশী আগন্তুক হিন্দুরা বাজারে এসে খোঁজ নিতে নিতে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বাবার ঠিকানা পেয়ে যায়। বাবা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, কবিরাজ। বিবিরহাট বাজারের মাঝামাঝি তার বড়ো ঔষধের দোকান ও চেম্বার। দুই মাস আগে অনিল-সুনীল দুই ভাইও এভাবেই আমাদের বাড়ি এসেছিল। বাবা রাতের মধ্যেই দুই ভাইকে ভারত যাওয়ার পথসঙ্গী ঠিক করে দেন। আমাদের বাড়িতে এক রাত কাটিয়ে পরদিন দুপুরের দিকেই চলে যায় তারা। আজ বাবার পেছনে ছেলেটিকে দেখে আমরা ভাবলাম সেরকমই কোনো অতিথি হবে।

বাবা ছেলেটিকে দেখিয়ে বলেন, ওর নাম নীলাম্বর। এখন থেকে ও আমাদের বাড়িতেই থাকবে। হলধর তো আর আসছে না। তার জায়গায় নীলাম্বর তোমাদের সঙ্গে কাজ করবে।

বলতে বলতেই ভেতরের ঘরে চলে গেলেন বাবা। ততক্ষণে নীলাম্বর তার কাঁধ থেকে প্লাস্টিকের চৌকো ব্যাগটা নামিয়ে হাতে নিয়েছে। কিন্তু কোথাও বসছে না, দাঁড়ানো অবস্থাতেই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

আমাদের পেছনে দুটি চেয়ার খালি। দাদা নীলাম্বরকে চোখে ইঙ্গিত করল চেয়ারে বসার জন্য। নীলাম্বর ধীর পায়ে এগিয়ে একটি চেয়ারে বসল, হাতের ব্যাগটা রাখল অন্য চেয়ারটিতে।

বাবা বলছিলেন হলধর দাদার কথা। হলধর দাদা ছিল আমাদের কাজের সরকার। পাঁচ মাইল দূরে হারুয়ালছড়ি গ্রামে তাদের বাড়ি। বছর চারেক আমাদের বাড়িতে থেকে কাজ করেছে। আমাদের জমির চাষবাস, গো-চারণ, বাজারঘাট ইত্যাদি সব করত। দাদা আর আমিও লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে হলধর দাদার সঙ্গে মাঠের কাজে যেতাম। হলধর দাদা মিলেমিশে একেবারে আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রামে মিলিটারি আসার পর সেই যে এপ্রিল মাসে তাদের বাড়ি গেল আর ফিরে আসেনি। কোথায় আছে কে জানে! পরিস্থিতি এমন কারও খোঁজখবর নেওয়ারও উপায় নেই। তার আশা ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাবা একদিন বলেন, 'তোমাদের পড়ালেখা যখন বন্ধ, চলো, আমরা নিজেরাই নিজেদের জমিতে কৃষিকাজ শুরু করি।' সেই থেকে দাদা আর আমি বাবার সঙ্গে নিয়মিত মাঠে যাই। গরু দিয়ে জমিতে হালচাষ করি, ক্ষেতে পানি সেঁচি, ধানের চারা রোপণ করি। মাঝে মাঝে আমরা দৈনিক ভিত্তিতে দুএকজন কাজের লোকও নিই। বাবা প্রতিদিন সকালে মাঠে গিয়ে আমাদের কাজ বুঝিয়ে দেন। ঘণ্টা দুই আমাদের সঙ্গে মাঠে থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে বাজারে তার

দোকানে চলে যান। আমরা দুই ভাই একটানা দুপুর পর্যন্ত মাঠে থাকি। বিকালে আবার মাঠে গিয়ে গরু চরাই। এখন নীলাম্বর এসেছে। হলধর দাদার মতো সেও কাজ করবে আমাদের সঙ্গে। আমাদের আনন্দ হলো খুব।

আমরা নীলাম্বরকে দেখছিলাম। সে চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ। দাদা নীলাম্বরের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, তোয়াঁরো বাড়ি কন্ডে ওয়া?

নীলাম্বর আগের মতোই বসে রইল চুপচাপ। চোখেমুখে একটু চিন্তিত ভাব। মনে হয় দাদার কথা বুঝতে পারেনি সে।

দাদা আবার বলল, তুমি কি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা বোঝো না? আমি জানতে চাইলাম, তোমার বাড়ি কোথায়?

এবার নীলাম্বর বলল, সিলেট।

সিলেট! আমরা সবাই চমকে উঠি। এই দুর্যোগের মধ্যে এত দূরে কীভাবে এসেছে! দাদা অবাক হয়ে বলে, তোমার বাড়ি সিলেট! কিন্তু তুমি থাকতে কোথায়? সিলেট থেকে এখানে এসেছ?

না, আমি সিলেট থেকে আসিনি। চট্টগ্রাম শহরেই থাকতাম। যুদ্ধ শুরু হলে আর বাড়ি যেতে পারিনি। এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে আসছি। বাড়ির লোকেরা কে কোথায় আছে জানি না।

নীলাম্বরের জন্য আমাদের মায়া হলো খুব। আহারে বেচারা! দুর্যোগের মধ্যে ঝড়ের পাখির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে সে নিশ্চয় এখানে এসে পড়েছে। বাবা তার ধর্মীয় পরিচয় আমাদের জানাননি। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে দাদা প্রশ্ন করে আবার, তোমার নাম তো নীলাম্বর, কিন্তু তোমার পুরো নাম কী?

আমার পুরো নাম নীলাম্বর বাড়ৈ। আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী।– বলতে বলতে নীলাম্বর কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। আরও যেন জড়োসড়ো হয়ে বসল।

আমরা সবাই চুপসে গেলাম এবার। নীলাম্বর এর আগে শহরে থাকত! বাবা তাকে নিয়ে এসেছেন আমাদের সঙ্গে মাঠে কাজ করবে বলে। কিন্তু চাষাবাদের কাজ কি কিছু জানে! আসলে বাবা হয়তো কাজের চেয়েও তার সাময়িক আশ্রয়ের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যাক, ওসব আমাদের ভাবনার বিষয় নয়। নতুন অতিথির যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আমাদের সেটাই দেখা

উচিত। আমাদের মধ্য থেকে দাদাই কথা বলছিল। আমি আর দিদি চুপচাপ শুনছি।

দাদা নীলাম্বরের অস্বস্তি ভাবটা কাটানোর জন্য এবার বলল, কোনো সমস্যা নাই। তুমি এই বাড়িতে আমাদের মতোই থাকবে।

তবে বাড়ির সামনের দিকটায় বেশি ঘোরাঘুরি করা যাবে না। ওদিকেই রাজাকার-মিলিটারি ওদের আনাগোনা। এখানে কেউ জানতে চাইলে তোমার নাম বলবে নীলাম্বর বড়ুয়া। বলবে তুমি আমাদের মাসতুতো ভাই। সীতাকুণ্ড থানার পন্থশীলা গ্রামে তোমাদের বাড়ি। আর আমরা তোমাকে 'নীলাম্বরদা' বলে ডাকব। ঠিক আছে?

নীলাম্বরদা সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়।

সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঠান্ডা মেঘলা আবহাওয়া। উঠোন পথঘাট সব ভেজা। রাতে নিশ্চয় বৃষ্টি হয়েছে। এখন অবশ্য বৃষ্টি নেই। আষাঢ় মাস শুরু হয়েছে। কৃষিকাজের জন্য এ সময় বৃষ্টি খুব দরকার। মাঠে মাঠে কৃষকদের বীজ ছড়িয়ে আমন ধানের চারা লাগানোর ব্যস্ততা। মাস খানেক পর সেই কচি কচি চারা তুলে ক্ষেতে ক্ষেতে রোপণ করা হবে। এর মধ্যে তৈরি করে নিতে হয় ধানিজমিগুলো। এখন আমাদের জমিগুলোতে সেই কাজ চলছে।

সকালের জলখাবার সেরে প্রতিদিনের মতোই তৈরি হলাম আমরা। বাবা, দাদা, আর আমি। আজ অবশ্য নীলাম্বরদাও আছে সঙ্গে। আমাদের হাতে-কাঁধে লাঙল-জোয়াল-মই আর আছে আমাদের দুটি তাগড়া বলদ গরু। গরু দুটির নাম আছে– কালু আর লালু। কালুটা একটু বদরাগী। উটকো কোনো মানুষ বা প্রাণী দেখলে শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। আজকেও তেমনটাই ঘটতে যাচ্ছিল। প্রথম দেখাতেই হোঁ হোঁ করে মাথা ঘুরিয়ে তেড়ে উঠে নীলাম্বরদাকে প্রায় ঢুঁশ মেরে দিচ্ছিল কালু। ভাগ্যিস, আমি আগে থেকেই সতর্ক ছিলাম। সজোরে টেনে রেখেছিলাম কালুর গলার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা। কালুর মাথা আর গলায় হাত বুলিয়ে বললাম, এই থাম থাম, এত রাগ দেখাস কেন কালু। উনি আমাদেরই মতো, এখন থেকে উনিই তোমাদের দেখভাল করবেন। উনার সঙ্গে ভাব করে ফেল।

আমাদের বাড়ির পেছনে মানে পশ্চিম দিকে বিস্তীর্ণ ধানিজমি। ওখানে আমাদেরও জমি আছে। আজ ওদিকের জমিতে আমাদের কাজ। জমিতে এসে দুই বলদের কাঁধে জোয়াল-লাঙল জুড়ে দিয়ে হালচাষ শুরু করলাম আমরা। হলধরদাদা চলে যাওয়ার পর থেকে এখন দাদাই মূলত এ কাজটা করে। গরুর পেছনে খুঁটি ধরে জমিতে লাঙল চালায়। বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন আর দাদাকে মাঝে মাঝে তালিম দেন। আমি আলের ওপর দাঁড়িয়ে কখনো দেখতে থাকি, কখনোবা কোদাল দিয়ে জমির কোনাগুলো খনন করে দেই। কারণ জমির কোনায় লাঙল চালানো যায় না।

আজও আমরা যে যার মতো করছি। ভেজা নরম মাটি। লাঙল আর কোদাল দুটোই চালানো যাচ্ছে সহজে। নীলাম্বরদা জমির আলের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের হালচাল গতিবিধি দেখছে একমনে। চোখের চাহনিই বলে দিচ্ছে এসব কাজ তার কাছে একেবারে নতুন। আমরা কেউই তাকে কোনো কাজের কথা বলছি না। আমাকে কোদাল চালাতে দেখে নিজে থেকেই সে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, কোদালটা আমাকে দাও, দেখি, আমি পারি কি না।

এতক্ষণ আমি যেভাবে কোদাল চালিয়েছি, নীলাম্বরদাও ঠিক সেভাবে চালাতে লাগল। কাজের প্রতি তার সত্যি আগ্রহ আছে বলতে হবে। আমি ভেতরে ভেতরে খুব খুশি। আমাদের ওপর কাজের চাপ কিছুটা অন্তত কমবে। বাবা আমাদের কাজকর্ম দেখে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

পুরো জমিতে একবার হাল চাষের পর দাদা মই জুড়ে দিলো এবার। মই চালানো একটু সহজ। তাই এ কাজটা আমার ভাগেই বেশি পড়ে। মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে দুই পাক দিতেই নীলাম্বরদা বলল, ছোটদা, আমাকে দাও না, আমি জমিতে মই দিতে পারব।

এবার আমি নেমে গিয়ে নীলাম্বরদাকে মইয়ের ওপর তুলে দিলাম। নীলাম্বরদা হাসি হাসি মুখে চালনা করতে লাগল গরুদের। বেশ মজা করেই মই দিলো সারা জমিতে। মই দেওয়া শেষ হতে হতে থির দুপুর। মাঠ থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম আমরা।

গোয়ালে গরুদের খাবার দিয়ে আমরা এলাম বাড়ির পেছনের পুকুরে। বড়ো এবং গভীর পুকুর আমাদের। পুকুরে স্বচ্ছ জলরাশি, শানবাঁধানো ঘাট। আমাদের স্নানের ব্যবস্থা এখানেই। ঘাটে নেমে নীলাম্বরদা বলল, আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয় সাঁতার জানো, কিন্তু পানিতে ডুব দিয়ে থাকতে পারো কতক্ষণ?

দাদা বলল, কত আর, বেশি হলে দু থেকে তিন মিনিট।

মাত্র! আমি ডুব দিয়ে পানির নীচে কতক্ষণ থাকতে পারি তোমরা দেখো। সময় গণনা শুরু করো।– বলেই এক গলা পানিতে নেমে দাঁড়াল নীলাম্বরদা। যেন লম্বা একটা নিশ্বাস নিলো এবার। তারপর টুপ করে ডুব দিলো পানিতে।

কোমর পানিতে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর দাদা। নীলাম্বরদা পানির নীচ থেকে কতক্ষণে ভেসে উঠবে? চার-পাঁচ মিনিট গড়িয়ে গেছে। নীলাম্বরদার ওঠার নাম নেই। ডুব দিয়ে গেল কোথায়? পানির নীচে এতক্ষণ থাকা যায়? ছয়-সাত মিনিট হয়ে গেল। পানির ভেতরে নীলাম্বরদাকে যক্ষে ধরল না তো? আমি ভয় পেয়ে ঘাটের ওপর উঠে এলাম। আমার দেখাদেখি দাদাও। দশ মিনিট গড়িয়ে গেল। পানির ভেতর থেকে হঠাৎ ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠল নীলাম্বরদা। উঠেই ডানে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে পানি ঝরাতে ব্যস্ত হলো। দুহাত দিয়ে নাক-মুখের ওপর থেকে পানি নিংড়ে নিশ্বাস নিতে নিতে হাঁপাতে লাগল।

এই দেখে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, নীলাম্বরদার কিছু হয়নি, বিলকুল ঠিকঠাক আছে। কিন্তু আমাদের চোখের পলক পড়ে না। কী অদ্ভুত ছেলেরে বাবা! পানির নীচে ডুব দিয়ে কেউ এতক্ষণ থাকতে পারে! দাদা বলল, আমরা কিন্তু চিন্তায় পড়ে

গিয়েছিলাম তোমার জন্য। পানির নীচে এতক্ষণ থাকলে কী করে তুমি?

সবকিছু প্র্যাকটিস আর চেষ্টা বড়দা, মনপ্রাণ দিয়ে চাইলে সবই আয়ত্ত করা যায়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি শিখতে চাই দাদা, আমাকে তোমার মতো ডুব দেওয়া শেখাবে?

নীলাম্বরদা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, অবশ্যই, আমি তো আছি। আস্তে আস্তে শেখাব।

নীলাম্বরদাকে ভীষণ ভালো লেগে গেল আমার। আমি খেয়াল করে দেখি, তার মেলামেশার ধরন খুব আন্তরিক। এরই মধ্যে আমাদের সবাইকে একেবারে আপন করে নিয়েছে সে। বাবাকে মামা, মাকে মাসি আর ঠাকুরমাকে আমাদের মতোই 'ঠাকুরমা' ডাকতে শুরু করেছে। বয়সে বড়ো হয়েও দাদাকে আর আমাকে নাম ধরে

ডাকে না। দাদাকে 'বড়দা', আর আমাকে 'ছোটদা' ডাকে। এমনকি নিজে থেকে দিদিরও একটি নাম দিয়েছে, 'রাঙাদি'। যেন আমাদের কতদিনের আত্মীয়তার সম্পর্ক!

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আমার বিছানায় অলস শুয়ে থাকার অভ্যেস নেই। গুলতিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের পেছন দিকের পুকুরের পাড়ে গাছগাছালি ভরা। আম জাম পেয়ারা আমড়া তাল নারকেল জামরুল কত গাছ! সব বাবার লাগানো। ফলের গাছ ছাড়াও আছে ঝোঁপালো বাঁশঝাড়। আলোছায়া ঠান্ডা-গরমে আমার ভালোই সময় কাটে ওখানে।

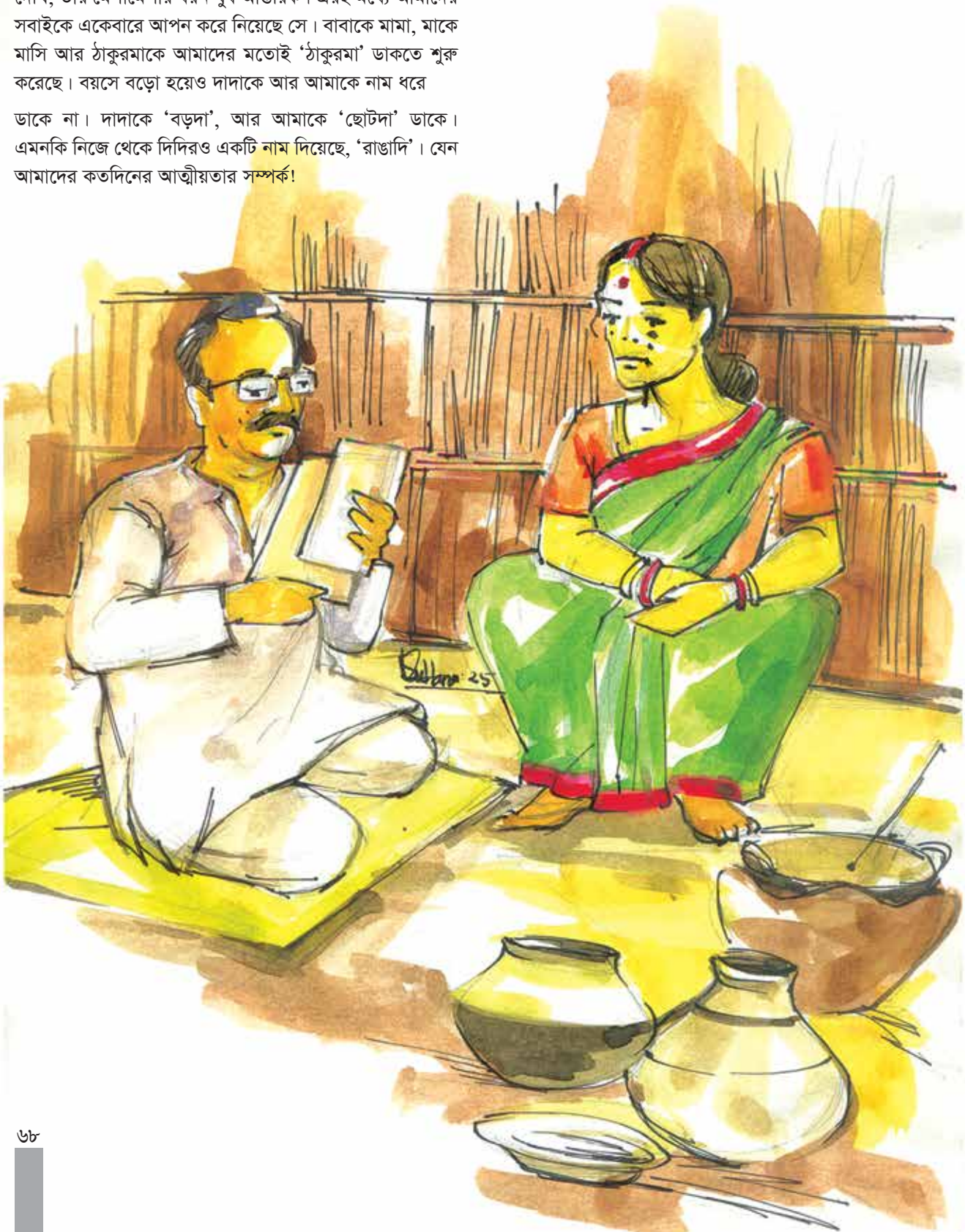

আজও গুলতিটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। নীলাম্বরদা দেখতে পেয়ে বলল, কই যাও?

বললাম, পেছনের পুকুর পাড়ে।

চলো, আমিও যাব।– বলতে বলতেই নীলাম্বরদা বেরিয়ে এলো আমার সঙ্গে।– তোমাদের বাড়িটা আসলে খুব সুন্দর। এই জংলাটা সময় কাটাবার জন্য দারুণ জায়গা। তুমি গুলতি দিয়ে এখানে কী করো?

এমনি, কিছু করি না। মাঝে মাঝে বাঘডাস, চিল এসে মুরগির বাচ্চার ওপর ছোঁ মারে, তখন গুলতি ছুঁড়ে ভয় দেখাই।

নীলাম্বরদা বলে, বাহ্, বেশ। শুধু শুধু কোনো পশু-প্রাণী শিকার করবে না কিন্তু। কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া ভালো না। তোমাদের গাছে দেখি এখনো আম আছে। ঐ যে গাছের মগডালে আম পেকে ঝুলে আছে।

আমি বলি, তুমি আম খাবে দাদা? গাছে উঠে আম পেড়ে আনব?

নীলাম্বরদা কেমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, গাছে উঠতে হবে! তোমার গুলতিটা দাও, দেখি।

আমার গুলতিটা হাতে পেয়েই নীলাম্বরদা গাছের উঁচু ডালের পাকা আমটাকে তাক করল। গুলতি থেকে পাথর-গুলিটা ছুঁড়তে দেরি, অমনি পাকা আমটা গাছ থেকে ছিঁড়ে পড়ল নীচে। আমি অবাক। কী নিখুঁত নিশানা! অন্তত বিশ হাত ওপরের গাছের ডাল থেকে গুলতি ছুঁড়ে আম পাড়া! আমার মুখে কোনো রা নেই। আমার সন্দেহ হলো, নীলাম্বরদা কি জাদুকর? নাকি অন্যকিছু? বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠে বললাম, কীভাবে

পারলে?

নীলাম্বরদার মুখে দুষ্টুমির হাসি, এ কোনো ব্যাপার না, শিখলে তুমিও পারবে।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার ভিরমি খাওয়ার দশা। মনে মনে ভাবি, নীলাম্বরদা না জানি আরও কতকিছু জানে! একটু সন্দেহও জাগে আমার মনে। হয়ত নিজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সে। লেখাপড়ার বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু বলে না। দাদা জানতে চাইলে বলেছিল, তেমন বেশিদূর লেখাপড়া করেনি। অথচ তার আদব-কায়দা, চলনধারা সবই বেশ উঁচুমানের, আবার কিছুটা রহস্যময়ও। হয়ত আমাদের বাড়িতে থেকে কাজ করার ব্যাপারটাও তার একটা ছদ্মবেশ। এ কারণেই হয়ত বাড়ির বড়োদের ধারে-কাছে সে বিশেষ ঘেঁষে না। চুপচাপ নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে।

যা হোক, বিস্ময়-ঘোরের মধ্যে একদিন কেটে গেল।

আজও পশ্চিম দিকের বিলেই আমাদের কাজ। যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি

আমরা। নীলাম্বরদা গোয়াল ঘরে গরুগুলোকে খাবার দিচ্ছে। আসলে সে চাইছে গরুগুলোর সঙ্গে ভাব করতে। বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। দাদাকে তিনি বললেন, নীলাম্বরকে কেমন মনে হচ্ছেরে?

দাদা ম্লান হাসে, আমাদের এসব কাজ তো সে কিছু পারে না বাবা। একেবারে আনাড়ি।

এখন কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক কোথায় পাব বল? তাছাড়া তার একটা আশ্রয় দরকার। এই দুর্দিনে সেই-বা কোথায় যাবে। থাকুক, তোমরা একটু শিখিয়ে দেখিয়ে নাও। কাজের প্রতি আগ্রহ আছে, সে পারবে।

এভাবেই কাজকর্ম চলছিল আমাদের। মাঠ আর বাড়ির কাজ নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকি আমরা। ইদানীং সামনের রাস্তাঘাটে মিলিটারি ও রাজাকার বাহিনীর লোকজনের চলাচলও বেড়ে গেছে খুব। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে রামগড় রোড। চট্টগ্রাম শহর থেকে উত্তর দিকের অঞ্চলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এটাই প্রধান পথ। মাঝে মাঝে ওদিকে ট্রাকে ট্রাকে মিলিটারি যেতে দেখি আমরা। আর রাতের বেলা অবিরাম গাড়ি চলে ও রাস্তা দিয়ে। কেবল ঝনঝন ঝরঝর করে শব্দ পাওয়া যায় সারারাত। আর ভেসে আসে গোলাগুলির শব্দ। কোথায় কে কাকে আক্রমণ করে আর মারে কে জানে! আমরা কেবল ভয়ে বাড়ির মধ্যে সেঁধিয়ে থাকি। দিনের বেলা পথেঘাটে অবাধে চলাচল করতে পারে শুধু বাবার মতো বয়স্ক, আধবয়সি বা বৃদ্ধরা। কম বয়সি তরুণ ছেলে ছোকরাদের নিয়েই যত সমস্যা।

এমন কাউকে পেলেই মিলিটারিরা ভাবে গেরিলা যোদ্ধা। অমনি পাকড়াও করে নিয়ে যায় থানায়। আমাদের থানা সদরেই মিলিটারিদের বড়ো ক্যাম্প। তাই সবাই সতর্ক। বাড়ির সামনের দিকে ঘোরাফেরা আমাদের জন্য একেবারে নিষেধ। তার ওপর নীলাম্বরদা নতুন মানুষ। তাকে দেখে কার মনে আবার কী সন্দেহ জাগে। তাই আমরা চলি খুব রয়েসয়ে। আমাদের বাজার-সদাই যা লাগে বাবাই আসার সময় নিয়ে আসেন অল্পসল্প। প্রতিদিনই বাজার থেকে ফিরে আমাদের কিছু না কিছু নতুন খবর দেন বাবা। আজকাল প্রায়ই বলেন মিলিটারিরা থানার ক্যাম্পে তাদের নতুন নতুন সৈন্য-সামন্ত আনছে, দিন দিন অস্ত্রশস্ত্রের জোগান বাড়াচ্ছে। আর কত লোক মারবে কী জানি।

এরই মধ্যে একটা ব্যাপার আমি অবাক লক্ষ করি। কীভাবে যেন নীলাম্বরদার সঙ্গে আমার দাদার ভাব হয়ে গেল খুব। যাকে বলে গলায় গলায় ভাব। একজনকে ছাড়া আরেকজন চলেই না। দুই জন খানিক পর পর ঘুসঘুস ফুসফুস করে কী যেন কথা বলে। বড়োদের ব্যাপারে নাকি ছোটোদের নাক গলাতে নেই। আমাকে তা-ই শেখানো হয়েছে। কী আর করি! আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর চুপ থাকি।

আরও কয়েকদিন কেটে গেল। এক রাতের বেলা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। দেখি আমার পাশে বিছানা খালি। দাদা নেই। দাদা আর আমি একই বিছানায় ঘুমাই। বারান্দার দক্ষিণ পাশের খাটে আমরা শুই। উত্তর পাশের খাটে শোয় নীলাম্বরদা। রাতে পাশে

বিছানায় দাদা নেই দেখে আমার ভীষণ ভয় ভয় লাগতে শুরু করল। রাতে হঠাৎ বাইরে যেতে হলে দাদা সাধারণত আমাকে জাগিয়ে যায়। কিন্তু আজ কিছু জানায়নি। তবে গেল কোথায়? একইসঙ্গে আমার মনে হলো, আচ্ছা, নীলাম্বরদা কি তার বিছানায় আছে? এমন মনে হতেই আমি ধড়ফড় করে উঠে বসি বিছানায়। অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে বারান্দার উত্তর পাশে যাই। খাটে হাত দিয়ে দেখি, ঐ বিছানাটাও খালি। তার মানে তারা দুজনই একসঙ্গে কোথাও গেছে! ঘরের বাইরে নিশ্চয়। ভাবতে ভাবতে আমি বারান্দার সদর দরজায় সরে আসি। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনির জায়গাটায় হাত রাখি। ছিটকিনি নিচের দিকে নামানো। দরজার মাঝখানের বুকবারিটাও লাগানো নেই, একপাশে সরানো। তবে আমার ধারণাই ঠিক। তারা দুজনই একসঙ্গে বাইরে গেছে, বাইর থেকে দরজার কপাট দুটি আবার ভেজিয়ে দিয়েছে। তাদের নিশ্চয় কোনো গোপন ব্যাপার আছে। একটু ভয় লাগলেও আমি সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলাম নিজেকে। চুপচাপ ফিরে এলাম বিছানায়। শুয়ে থাকি একা একা। কিন্তু আর ঘুম আসছে না আমার। অনেক সময় গড়িয়ে গেল। কোথায় যেন একটি হুতুমপ্যাঁচা ডাকছে একটানা। হঠাৎ দরজা খোলার আভাস পেলাম। একটু পরেই টের পেলাম দাদা এসে শুয়ে পড়ছে আমার পাশে।

এই রাতের কথা কাউকে জানাই না আমি। দাদা বা নীলাম্বরদার কাছেও জানতে চাই না কিছু। তারাও নিজে থেকে কিছু জানায় না আমাকে।

আরও দুদিন কেটে গেল। এর পরের গভীর রাতে ঘুম ভাঙল এক বিকট শব্দে। এবার শুধু আমার নয়, এই হাড় কাঁপানো শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বাড়ির, পাড়ার, গ্রামের সবার। আমাদের পুরো গ্রাম যেন কেঁপে উঠেছে থরথরিয়ে। ভয়ে আতঙ্কে প্রথমে যেন জমাট পাথর হয়ে গেল সবাই। তবু সবারই এক ভাবনা হঠাৎ কোথায় কী হলো? কোন দিক থেকে নতুন কোন বিপদ ঘনিয়ে আসল আবার? সহসাই আতঙ্ককে যেন ছাপিয়ে উঠল কৌতূহল। অন্ধকারেই কেউ কেউ বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। হ্যারিকেন হাতে ভেতরের ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন বাবা। সদর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ান। দরজার ছিটকিনি বুকবারি দুটোই খোলা কেন? উত্তর-দক্ষিণ দুই খাটে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাবা জানতে চান, নীলাম্বর আর নাটু কি আগেই বেরিয়েছে?

আমি খাটের ওপর বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলি, আমি ঠিক জানি না বাবা।

বাবার পেছন পেছন আমিও বেরিয়ে পড়ি উঠোনে। ততক্ষণে উঠোনে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছেন নীতিপূর্ণ জ্যাঠা আর অনঙ্গ কাকা। সবার দৃষ্টি উত্তর-পূর্ব কোণে। ওদিকে আকাশ লাল, আগুনের আভা। তবে কি কারও বাড়িতে আগুন লেগেছে? কিন্তু এমন বিকট শব্দ হলো কেন? কোত্থেকেই-বা হলো শব্দটা? সেই সঙ্গে বারুদের গন্ধও যেন ভেসে আসছে বাতাসে। সবাই হতচকিত, সন্ত্রস্ত।

হঠাৎ একটি টর্চের আলো দৃষ্টি কেড়ে নিলো আমাদের। সামনের পুকুরের উত্তর পাড় দিয়ে পুবদিক থেকে এগিয়ে আসছে কেউ।

কাছে আসতেই দেখি ওটা ইন্দু কাকা। হন্তদন্ত হয়ে আমাদের উঠোনে ছুটে এসেছেন তিনি। চোখেমুখে তার উত্তেজনা আর উদ্ভ্রান্ত ভাব। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, দাদা, আপনারা শুনছেন, ভয়াবহ কাণ্ড। কারকনদের বাড়ির কাছে ছড়ার ওপর কাঠের পুলটা কারা যেন উড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে সবাই বলাবলি করছে, ওটা মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের কাজ। বিকট শব্দটা ছিল বিস্ফোরকের। ওখানে এখন আগুন জ্বলছে। কাঠের পুল ছত্রখান হয়ে গেছে। মানুষ গাড়ি কিছু পারাপারের কোনো কায়দা নাই আর।

আমি খেয়াল করে দেখি, এতক্ষণ সবার চোখেমুখে যে আতঙ্ক ছিল, তা যেন উবে গেছে এ মুহূর্তে। মেঘের আড়ালে যেন রোদের ঝিলিক। গেরিলা আক্রমণের কথা শুনে সবার মনে যেন কেমন এক আশার সঞ্চার হয়েছে।

সবাই জানে চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে এদিক থেকে যোগাযোগের জন্য এই রামগড় রোডই একমাত্র সোজা পথ। কারকনদের বাড়ির কাছের ছড়াটা একেবারে ছোটো নয়। অন্তত বিশ গজ চওড়া। বর্ষাকালে এই ছড়া থাকে জলে ভরভর, খরতর। পুল ছাড়া এ পথে গাড়ি যাতায়াত অসম্ভব। হয়তো পশ্চিমা মিলিটারিদের দৌরাত্ম্য রোধ করার জন্য গেরিলা যোদ্ধারা পরিকল্পিতভাবে এই পুলটা ধ্বংস করেছে।

কিন্তু পাকিস্তান মিলিটারি বাহিনী কি নীরবে এই ধ্বংসযজ্ঞ মেনে নেবে? পুলের গুরুত্ব ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন প্রশ্ন মাথায় আসেই। বাবা বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, দেখো, আমাদের পুলকিত হওয়ার কিছু আছে বলে মনে করি না। এর দায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপরই এসে পড়ে।

ইন্দু কাকা বলে উঠলেন, ওদিকে সবাই বলাবলি করছে, এতে আমাদের বিপদ আরও বাড়বে। মিলিটারিরা বদলা নেওয়ার জন্য আমাদের ওপরই চড়াও হতে পারে। পুরো গ্রামে জ্বালাও পোড়াও আর মারধর করতে পারে। ওদিকে সবাই এখনই বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

বাবা-কাকাদের জল্পনা-কল্পনা শুনতে শুনতে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠি আমি। ভেতরে আমার এক চাপা উত্তেজনা। মনে খচখচ করছে অন্য একটি বিষয়। নীলাম্বরদা আর আমার দাদা বাড়িতে নেই। তাদের দেখাও নেই অনেকক্ষণ। তারা দুজন গেল কোথায়? সবাই আবার বাড়ি ছেড়ে পালাবার কথা বলছে।

রাতের আঁধার কাটতে আর বেশি দেরি নেই। আমি বাবার হাত থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে বাড়ির ভেতরে ফিরে এলাম। ভীষণ অস্থির লাগছে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। টেবিলের ওপর হ্যারিকেনটা রেখে আমি বিছানা গোছাতে শুরু করলাম। আমার বালিশটা ওঠাতেই একটা ভাঁজ করা কাগজ চোখে পড়ল হঠাৎ।

ঝটপট কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুললাম। ওমা, এ যে একটা চিঠি! চিঠির শুরু মা-বাবাকে সম্বোধন দিয়ে, শেষে কাগজের নীচ দিকে আছে দাদার নাম ও স্বাক্ষর। চিঠিতে দাদা লিখেছে–

পূজনীয় মা ও বাবা,

তোমরা যখন এই চিঠি পড়ছ, আমি তখন তোমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে। জানি, তোমরা ভীষণ অবাক হচ্ছ। ভাবছ, আমি কেন হঠাৎ তোমাদের ছেড়ে এমন দূরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দূরে না এসে আর উপায় ছিল না মা। গ্রামে আমার বয়সি আর একটি ছেলেও নেই। সবাই আগে আগে চলে গেছে। আমি যেতে চাইলে তোমরা তখন রাজি হওনি। মিলিটারিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাঠে মাঠে কৃষি কাজ করে আর কতদিন থাকা যায় বলো! মাঠে ফসল ফলানোর চেয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা অনেক মহৎ ও শ্রেয়তর কাজ মা। আমার বন্ধুরা সবাই যুদ্ধে গেছে। আমিও যুদ্ধে যাচ্ছি। ভাবছ বুঝি, এতদূর পথ আমি একা কেমন করে যাব! না মা, না বাবা, আমি একা নই। সঙ্গে নীলাম্বরদাও আছে। তোমরা আমার জন্য ভেবো না, নীলাম্বরদা পথ চিনিয়ে আমাকে ঠিক নিরাপদে নিয়ে যাবে। ও হ্যাঁ, তোমাদের বলা হয়নি, নীলাম্বরদা নিজেও কিন্তু একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গেরিলা যোদ্ধা, বিস্ফোরক দলের সদস্য। একটি নির্দিষ্ট গেরিলা মিশনের লক্ষ্য নিয়ে 'কাজের লোকের' ছদ্মবেশে সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। কারকনদের বাড়ির কাছে ছড়ার ওপর কাঠের পুল গুড়িয়ে দেওয়া ছিল তার গেরিলা মিশন। আমাদের বাড়িতে থেকে সে কাঠের পুলের সার্বিক অবস্থা রেকি করে পাঠিয়ে ছিল নিখুঁতভাবে। তার রেকির ওপর ভিত্তি করেই পরিচালনা করা হলো আজকের সফল অভিযান। জানি, এর জন্য তোমরা মানে আমাদের পুরো গ্রাম বিপাকে পড়েছে, হয়ত এখন তোমাদের জীবন বিপন্ন। তবু এই পরিস্থিতিকে তোমরা অকারণ ঝঞ্ঝাট মনে করো না, দেশের স্বাধীনতার জন্য এমন কত ঘটনা ঘটতে পারে! যা হোক, তোমরা নিরাপদে থেকো, ভালো থেকো। ঠাকুরমা, পুষি আর মিঠুকে দেখে রেখো। তোমরা সবসময় আমার জন্য শুভ কামনা করো। তোমরাই আমার শক্তি, সাহস, প্রেরণা। তোমাদের জন্য আমি অফুরন্ত মুক্ত বাতাস নিয়ে ফিরতে চাই। আশা করি আবার দেখা হবে স্বাধীন স্বদেশে–

ইতি
তোমাদের চোখের মণি
নাটু।

চিঠির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আমি রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম মায়ের কাছে। মা পশ্চিম দিকের বারান্দার দরজা খুলে ঘর ঝাঁট দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি তড়বড় করে মাকে বলি, মা, দাদা তো নাই।

কেন, কী হয়েছে, কোথায় গেছে?– জানার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন মা।

দাদা নীলাম্বরদার সাথে যুদ্ধে চলে গেছে।– বলতে বলতে আমি মার দিকে দাদার লেখা চিঠিটা বাড়িয়ে ধরি।

মা চিঠিটা হাতে না নিয়েই অবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, কী এসব, কী আবোলতাবোল কথা!– মুখের কথা শেষ না হতেই মা ধপ করে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝেতে। নিমিষে চোখ বড়ো বড়ো করে হাত-পা ছড়িয়ে দিলেন কাঁপুনি দিয়ে।

আমি বুঝলাম মা মূর্ছা গেছেন। হতবুদ্ধি হয়ে প্রথমে ঠাকুরমাকে ডাকি, ঠাকুরমা জলদি এসো, মা কেমন করছে দেখো।

তারপর আমি ছুটলাম বাবার কাছে। বাবা উঠোন থেকে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। উঠোনে বেরিয়ে আসা কাকা জ্যাঠারা ফিরে গেছেন যে যার বাড়িতে। সবাই এখন নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাওয়ার ধান্দায় আছে।

আমি বিমূঢ় কণ্ঠে বাবাকে বলি, দাদা যুদ্ধে চলে গেছে শুনেই মা মূর্ছা গেছে। আমার বালিশের তলায় দাদা এই চিঠি রেখে গেছে, দেখো।

বাবা চিঠিটা পড়তে পড়তে মার কাছে ছুটে আসেন। ততক্ষণে ঠাকুরমা মার চোখেমুখে পানি ছিঁটাতে শুরু করেছেন। বাবা গম্ভীর মুখে সরিষার তেলের বোতলটা টেনে নিয়ে বসেন। মার হাত-পায়ের তালুতে সরিষার তেল মাখিয়ে মালিশ করতে থাকেন বার বার।

অনেকক্ষণ পর মা চোখ খুললেন। বুকের ওপর দুহাত রেখে হঠাৎ বিলাপ করে ওঠেন, ও আমার বুকের মানিকরে, তুই কোথায় গেলিরে সোনা।

বাবা মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, শোনো, এমন করো না, ছেলের জন্য–

আচমকা বাবার দিকে আঙুল তুলে মা কঠিন চোখে তাকান। বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি, আপনি কোনো কথা বলবেন না। আপনার জন্য আমি আমার ছেলেটাকে হারালাম। আরেক জনের উপকার করতে গিয়ে আমার এত বড়ো ক্ষতিটা করলেন আপনি। আপনার কী দরকার ছিল নীলাম্বরকে বাড়িতে এনে রাখার?

বাবা নিচু স্বরে বলেন, তুমি শান্ত হও, কেউ শুনতে পাবে। এখন কারও দোষ-গুণ বিচার করার সময় নয়। আমরা বড়ো বিপদে আছি। এখনই মিলিটারি এসে পুরো গ্রাম তন্নতন্ন করে শত্রুসেনা খুঁজবে, সবকিছু তছনছ করে দেবে। আমাদের বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও পালাতে হবে। চলো। তুমি ভুলে যেও না, তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধার মা। এ সৌভাগ্য সবার হয় না। তোমাকে বাঁচতে হবে। ছেলের মঙ্গল কামনা করো, সে যেন সফল হয়, সুস্থ শরীরে ফিরে আসে।

———— ○ ————

রক্ত গোলাপ ফুল

কাদের বাবু

স্বাধীনতা আমার সকালবেলা
লাল টকটকে সূর্য
স্বাধীনতা আমার সন্ধ্যা হলে
অবাক করা তুর্য।

স্বাধীনতা আমার প্রকৃতির মাঝে
অপূর্ব এক সৃষ্টি
স্বাধীনতা আমার বন্ধু আড্ডায়
রুমঝুমঝুম বৃষ্টি।

স্বাধীনতা আমার সোনালি বিকেল
প্রিয়ার স্নিগ্ধ হাসি
স্বাধীনতা আমার রাখাল ভায়ের
মধুর সুরের বাঁশি।

স্বাধীনতা আমার ধানের শীষে
ঢেউ খেলানো সুর
স্বাধীনতা আমার ছোট্টবেলায়
নিয়ে যায় বহুদূর।

স্বাধীনতা আমার প্রিয় আপুর
নোলক, কানের দুল
স্বাধীনতা আমার প্রিয়ার খোঁপায়
রক্ত গোলাপ ফুল।

স্বাধীনতার সুখ

আতিক রহমান

স্বাধীনতা ওই বিশাল আকাশে নীলের খাতায় আঁকা
স্বাধীনতা ওই স্বপ্নের নদী বয়ে গেছে আঁকাবাঁকা!
আমি তো স্বাধীন তাই তো স্বাধীন ভাবনার ছবি আঁকি
আমার দুচোখে সবুজে-সবুজে স্বপ্নের মাখামাখি।
স্বপ্ন আমার স্বপ্নের মতো স্বাধীন হাওয়ায় ভাসে
ভোরের সোনালি রোদের খেলায় আমার স্বপ্ন হাসে!
আঁধার রাতের জ্যোৎস্নার ফুল-তারাদের ঝিলিমিলি
আমার মনের রঙিন আবেগে কেটে যায় তারা বিলি।

আমার স্বপ্ন লাল ইতিহাসে সবুজ বর্ণমালা...
আমার স্বপ্ন মায়ের অশ্রু, বোনের বুকের জ্বালা
আমার স্বপ্ন সফলতা পেলো লাখো বীরদের প্রাণে
একটি সাগর রক্ত আমার স্বপ্নকে বয়ে আনে।

স্বাধীনতারই সেই ঘোষণায় আমার স্বপ্ন বোনা...
আমার স্বপ্ন প্রিয় স্বাধীনতা মুক্ত-মানিক-সোনা।
যুদ্ধে-যুদ্ধে নয় মাস শেষে উঠল নতুন রবি–
সেই সে স্বাধীন সূর্যে হাসলো আমার দেশের ছবি!
অধীনতা থেকে স্বাধীন হলাম এমনি করেই আমি;
বিজয়ের সুখে এদেশ আমার প্রাণের চেয়েও দামি।

বাংলাদেশ

এস ডি সুব্রত

কত ত্যাগ-তিতিক্ষা কত সম্ভ্রম
পিচ ঢালা পথ শ্যামল প্রান্তর
রক্ত খুনে হয়েছিল জখম
অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সোনালি রোদ্দুর,
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা
স্বপ্ন যাত্রায় পাল তোলা নৌকা
অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা
এনেছিলে স্বাধীন বাংলা বুকভরা হাসি,
অবারিত সবুজ শ্যামল দূর্বা ঘাস
ফুল ফল পাখি প্রিয় স্বাধীন ভূমি
রক্তে কুড়ানো স্বপ্নের ঠিকানা,
মুক্তির পথে নির্ভীক অভিযাত্রা
একটি মানচিত্র নিজের ভূখণ্ড
অবশেষে স্বপ্নের ঠিকানা বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধ

মোল্লা আলিম

ছাব্বিশে মার্চ শুরু যুদ্ধ উনিশশো একাত্তরে
নয় মাসে বিজয় এলো ষোলোই ডিসেম্বরে
রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের করুণ ইতিহাস
তিরিশ লক্ষ শহিদ লাশের গন্ধে ভরা আকাশ
সম্ভ্রম হারা আড়াই লক্ষ মা-বোনের আর্তনাদ
অত্যাচারী পাকিস্তানি হলো তাই বরবাদ
রক্ত দিলো স্বাধীনতা বাংলা মায়ের জন্য
বীর বাঙালি মুক্তিসেনা সবাই তাই ধন্য
বাবামায়ের বুকের ধন আজকে যারা নাই
শহিদ হয়ে ঘুমিয়ে আছে বাংলাদেশের ভাই
লাল-সবুজের পতাকা আজ আকাশেতে ওড়ে
মুক্তিসেনা বিজয় এনে দিলো বাংলার ঘরে
নব্বই হাজার পাকসেনা পরাজয়ের বেশ
লজ্জিত হয়ে শেষে ছাড়লো বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা তুমি

বিজন বেপারী

স্বাধীনতা তুমি
ফাগুন দিনে কোকিল ডাকা ভোর,
স্বাধীনতা তুমি
চৈত্র মাসের রৌদ্র তাপের জোর।
স্বাধীনতা তুমি
বৈশাখি ঝড় উথালপাথাল ঢেউ,
স্বাধীনতা তুমি
জ্যৈষ্ঠ মাসের বাহারি ফল স্বাদে ভরা কেউ।
স্বাধীনতা তুমি
আষাঢ় মাসের এক পশলা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি,
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে ভেজা পল্লিবধূর মধুর সে দৃষ্টি।
স্বাধীনতা তুমি
ভাদ্র মাসে নদীর তীরে কাঁশফুলের দোল,
স্বাধীনতা তুমি
আটচালাতে মায়ের পুজো ঢাকি বাজায় ঢোল।
স্বাধীনতা তুমি
কার্তিক মাসে ধানের শীষে এক ফোঁটা জল,
স্বাধীনতা তুমি
নবান্নের দেশ আত্মহারা জোগাও শান্তি বল।
স্বাধীনতা তুমি
পৌষের শীতে গরম জামা ক্ষেতের শ্যামল শোভা
স্বাধীনতা তুমি
মাঘ পূর্ণিমায় চন্দ্র বদন দারুণ মনোলোভা।

রক্তে কেনা স্বাধীনতা

কাব্য কবির

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা কেনা,
দেশের জন্য প্রাণটা দিলো লক্ষ মুক্তিসেনা।
দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ জয়ে গেল,
যুদ্ধে গিয়ে প্রাণটা হারায়, কেউবা ফিরে এলো।

পাকবাহিনী করলো গুলি ঝাঁঝরা হলো বুক,
আর পেল না দেখতে ওরা মা ও বোনের মুখ।
ওদের লাশের গন্ধ আজও এই বাতাসে ভাসে,
দেশের জন্য জীবন দিয়ে মরেও ওরা হাসে।

ওদের জন্য কাঁদে আকাশ, বাংলা মায়ের মাটি,
রক্তে ভেজা সেই মাটিটা সোনার চেয়ে খাঁটি।

বাংলা আমার মাতৃভূমি

মো. তাইফুর রহমান

পাতার ফাঁকে দেখি আমি
হলদে পাখির বাসা
বাংলা আমার মাতৃভূমি
বাংলা ভালোবাসা।

বকুল তলে বন্ধু আমার
ফুলের মালা গাঁথে
চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে
দেখি নিঝুম রাতে।

হাতছানি দেয় স্বপ্নগুলো
আমায় শুধু ডাকে
আমি তো ভাই সুখ খুঁজে পাই
শান্ত নদীর বাঁকে।

ফুলের গন্ধে ছন্দ লিখি
ভরি কাব্য খাতা
ফুল কলিরা নৃত্য করে
দোলায় তারা মাথা।

দেহ আমার শীতল যে হয়
বাতাস ঝিরিঝিরি
সন্ধ্যা হলে আপন নীড়ে
মায়ের কাছে ফিরি।

স্বাধীন যখন

নাটু বিকাশ বড়ুয়া

আমরা যখন স্বাধীনতার
গৌরবে পথ চলি
স্বাধীন নিয়ে গল্প করি
সাজাই গানের কলি।

স্বাধীনতার সেই ইতিহাস
হৃদয়পটে জাগে
স্বাধীনতা দোলে ওঠে
স্বপ্ন অনুরাগে।

মার্চের সেই কালরাতটা
তোলে দাবির কথা
সেই দাবিরই পথটি ধরে
পেলাম স্বাধীনতা।

শরণার্থী শিবির

জসীম আল ফাহিম

"এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়। প্রখর রৌদ্র। রোদের উত্তাপে মাঠ-ক্ষেত তেতে উঠেছে। হাওরে বোরো ধান পেকেছে। পাকা ধান কাটার জো নেই। পুকুর ভরা মাছ। সেই মাছ ধরে বিক্রি করারও ব্যবস্থা নেই। গোয়াল ভরা গরু। দুধেল গাই, বাছুর। ঠিকমতো দুধ দোহানো হয় না। দুধ দোহন করে কী হবে– খেয়ে শেষ করা যায় না। গরুগুলো দেখভালেরও উপায় নেই। কারণ কাজের শ্রমিক পাওয়া যায় না। কাজকর্ম ফেলে প্রাণভয়ে মানুষ দল বেঁধে সপরিবার সীমান্তের ওপারে ছুটে যাচ্ছে। ওখানে 'লালপানি' নামক স্থানে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। লোকজন নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।"

এটুকু বলে অর্কের নানাভাই একটু থামলেন। তার চোখ দুটো ছলছল করছিল। গামছার কোনায় চোখ মুছে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অর্ক নানাভাইয়ের মনের অবস্থা কিছুটা আঁচ করতে পারল। বলল, নানাভাই! তোমার মনটা কি খুব খারাপ হয়ে গেছে?

নানাভাইয়ের নাম আবদুল গফুর। গফুর সাহেব বললেন, মন তো কিছু খারাপ হবেই। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে কি না। ও কিছু না নানাভাই। তারপর কী হলো শোন।

বলে তিনি আবারও বলতে শুরু করলেন।

'সারাদেশে তুমুল মুক্তিযুদ্ধ চলছে। পাকিস্তানি মিলিটারিরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় আক্রমণ চালাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে রাজাকাররা শান্তিকমিটি গঠন করছে। কী শান্তি যে তারা প্রতিষ্ঠা করছে আমার মাথায় ঠিক ঢুকে না। কারণ তারা সবসময় খুঁজে বেড়ায় কোন বাড়ির ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। কার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। অমুক-তমুককে ধরে আনো। বাড়িঘরে আগুন দাও। এসব করতে করতেই তাদের সময় ফুরাত। শুধু তা-ই নয় রে নানাভাই। ওরা লোকজনের বাড়িঘরে লুটপাট করত। ঘরে সোনাদানা, টাকাপয়সা যা পেত, সবই কেড়ে নিত। বিশেষ করে হিন্দু লোকদের মিলিটারির ভয় দেখিয়ে বাড়িঘর থেকে বের করে দিত। পরে জায়গা-জমি দখল করে নিত। কেউ যদি গোঁ ধরে বসত যে, কিছুতেই বাড়ি ছাড়বে না। তখন তারা রাতের আঁধারে নিজেরাই গিয়ে ঐ বাড়িতে হানা দিত। বাড়ির মেয়েছেলেদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করত। আর পুরুষগুলোকে গুলি করে মেরে মাটি চাপা দিত।'

নানাভাই আবারও একটু থামলেন। তার গলায় কিছু একটা আটকে আছে বলে মনে হলো। তিনি গলাটা একটু খাকাড়ি দিয়ে বলতে শুরু করলেন।

"পরিস্থিতি যখন এমনি পর্যায়ে এসে ঠেকল, একদিন রাতের বেলা রাজাকার গোলাম আলি এলো আমাদের বাড়ি। সঙ্গে আরও কয়েকজন সশস্ত্র রাজাকার।

গোলাম আলি বলল, 'গফুর ভাই। তোমাদের জন্য আমি আর কিছুই করতে পারছি না। তোমার ছেলেটা মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম না-লেখালে একটা কথা ছিল। আমি মেজর সাবকে অনেক বুঝিয়েছি যে, তোমরা আমার আপনার লোক। কিন্তু তার এককথা, তোমার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে। কাজেই তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া যাবে না।' ভাবতে পারিস নানাভাই তখন আমার মনে অবস্থা কেমন হয়েছে!"

অর্ক কিছু বলতে পারল না। চুপ হয়ে নানাভাইয়ের মুখপানে তাকিয়ে রইল। নানাভাই বলতে লাগলেন।

'গোলাম আলির কথা শুনে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল প্রবাহ নেমে গেল। আমি বুঝতে পারলাম আমার বাড়িঘর

সহায়-সম্পত্তির ওপর ওর কুনজর পড়েছে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ঘরে আমার বিবাহযোগ্যা কন্যা তোর মা আমিনা, তোর খালা সখিনা রয়েছে। এদিকে তোর নানিও চলতে ফিরতে পারে না। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়েবসে দিন কাটায়। কী যে করি এখন! আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।'

এটুকু বলে নানাভাই কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন। পরে বলতে লাগলেন।

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোলাম আলি! তুমি এখন আমাকে কি করতে বলছ?'

আমার এরূপ প্রশ্ন শুনে সে আমার চোখের দিকে মুখের দিকে তাকাতে পারল না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তোমার বড়ো মেয়েটাকে একবার যদি মিলিটারি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দাও। তাহলে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, মিলিটারিরা এদিকে আর আসবে না। এখন ভেবে দেখো– কী করবে।'

গোলাম আলির কথা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। বলে কী সে! আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললাম, 'আচ্ছা। ভেবে দেখি।'

গোলাম আলি বলল, 'সময় বেশি নেই। যা ভাবার তাড়াতাড়ি ভেবে ফেলো।'

বলে সে তার সঙ্গী রাজাকারদের নিয়ে ফিরে গেল।

সেই রাতে তোর ছোটন মামা বাড়ি ফিরল। আমি তাকে সবকিছু খুলে বললাম। শুনে তোর মামা বলল, 'আর একমুহূর্তও বাড়িঘরে থাকা চলবে না বাবা। এখনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।'

ছোটনের কথা শুনে আমি বললাম, 'তুই আমাদের কী করতে বলছিস রে বেটা! কোথায় যাব আমরা?'

তোর মামা বলল, 'লালপানি শরণার্থী শিবিরে যাব। হায়েনাদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে হলে আর কোনো পথ নেই বাবা।'

ওর কথা শুনে আমি হুহু করে কেঁদে উঠলাম। ভাবলাম– এই বুঝি লেখা ছিল কপালে। নিজের বাড়িঘর ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে হবে! হায় পোড়াকপাল!

পরে বললাম, 'আমাদের বাড়িঘর, জায়গা-জমি, এসবের কী হবে রে বেটা?'

ছোটন বলল, 'ওসব নিয়ে এখন ভাববার সময় নেই বাবা। বেঁচে থাকলে দেশ স্বাধীন হলে ওসব আমরা ফিরে পাব। রাজাকারেরা যখন হুমকি দিয়ে গেছে, ওরা যে-কোনো সময় আবার চলে আসতে পারে। কাজেই আমাদের দেরি করা চলবে না।'

ঘরে নগদ টাকাপয়সা, অলংকারপাতি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যা না-হলেই নয়, আমরা কয়েকটা গাঁটরিতে ভরে নিলাম। গরুগুলোর গলার দড়ি কেটে স্বাধীন করে দিলাম। যাতে ওরা ইচ্ছেমতো হাওরে গিয়ে ঘাস খেয়ে ফিরে আসতে পারে। ইচ্ছে না-হলে না-আসে। ঘরগুলো তালাবদ্ধ করা হলো। আমরা লালপানি শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। দুটো কাঠ জোড়া দিয়ে একটা মাচান বানালাম। ওই মাচানে তোর নানিকে বসিয়ে আমি আর তোর মামা কাঁধে বহন করে নিয়ে যাব।

আমরা রওয়ানা হয়ে যাব, ঠিক এমনি সময় রাজাকার গোলাম আলি আরও চারজন সশস্ত্র রাজাকার সঙ্গে নিয়ে কী মনে করে যেন আমাদের বাড়ি এলো। এসে ঝামেলা পাকাতে লাগল।

মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'আমার কথা তাহলে তোমাদের কানে ঢুকেনি! পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটছো। তো দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।'

বলে সে বাড়ির বাইরে অবস্থান গ্রহণ করল। আর মিলিটারিদের খবর দিতে সঙ্গী একজন রাজাকারকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলো।

এদিকে ছোটন আমাকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'বাবা! ওরা গোলমাল পাকাতে বসে আছে। মনে হচ্ছে আমাদের যেতে দেবে না। আমি ওদের একটা শিক্ষা দিয়ে আসি।'

বলে ছোটন ওর এলএমজিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার পরক্ষণেই বাড়ির বাইরে শুনতে পেলাম একঝাঁক গুলির শব্দ। ভয়ংকর আর্তনাদ। মুমূর্ষুর কোঁকানো। ততক্ষণে তোর মামা ফিরে এলো। বলল, 'বেইমানগুলোকে চিরদিনের মতো শায়েস্তা করে এলাম। এবার চলো বাবা।'

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। জোনাক পোকা জ্বলছে আর নিভছে। দুটো কলাবাদুর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ডানা ঝাঁপটে উড়ে গেল। পথের পাশে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। আমরা লালপানি শরণার্থী শিবিরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

আমরা আধা মাইলের মতো পথ এগোলাম। মন কিছুতে বাধা মানছে না। বার বার পিছন ফিরে তাকাই। প্রিয় বাড়িঘর ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমাদের বাড়িঘরে দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে। দেখে আমার পা আর চলছে না। চোখ ভিজে গেল অশ্রুতে।

ছোটন বলল, 'বাবা! এখন মন খারাপের সময় না। কষ্ট করে সামনে হাঁটো। রাতের মধ্যেই আমাদের বর্ডার ক্রস করতে হবে।'

আমি হাঁটতে থাকি। তোর মা-খালারাও হাঁটতে থাকে। তোর নানি মাচানে শুয়ে হু হু করে কাঁদছে। না-কেঁদে কী করবে। কাঁদা ছাড়া যে আমাদের আর কিছুই করার নেই।

লালপানি শরণার্থী শিবিরে আমরা যখন পৌঁছালাম, তখন ভোর চারটা বাজে। দূর মসজিদে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ফজরের আজান ধ্বনি ভেসে এলো। ভোরের পাখিরা রাত্রির অন্ধকার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আলোকময় জগতে মুক্তির আনন্দে মেতে উঠল। কিন্তু আমরা! আমাদের মনে কোনো আনন্দ নেই। মন ভরা দুঃখ-হতাশা। আমাদের সামনে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

লালপানি শরণার্থী শিবিরে এসে দেখি শুধু মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ দেখে আমার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। এত মানুষ কেন এখানে? কম করে হলেও লাখ দেড়েক মানুষ। এত মানুষের ভিড়ে আমাদের জায়গা কোথায় হবে? আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। ধনী-দরিদ্র, সচ্ছল-অসচ্ছল, ভালো-মন্দ সবরকম মানুষের

বিপুল সমারোহ। বিভিন্ন বয়সের মানুষ। বিভিন্ন চেহারার মানুষ। নারী-পুরুষ সকলেই এখানে এসে ভিড় করেছে। প্রাণভয়ে নিজেদের দেশ ছেড়ে, নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে আমাদের মতো ওরাও হয়ত এই শরণার্থী শিবিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সকলেরই চোখমুখে নিদারুণ অনিশ্চয়তা!

তোর মামা আমাদের একটা গাছতলায় এনে বসালো।

মনে মনে ভাবলাম– জীবন বড়োই অদ্ভুত! গতকালও আমাদের সবকিছু ছিল। দেশ ছিল, ঘরবাড়ি ছিল, জমি-জিরাত ছিল। আর ছিল মন ভরা স্বপ্ন-আশা। অথচ সকাল হতেই আমাদের জায়গা হলো গাছতলায়। আহা-হা! সারারাতের অনিদ্রায় আমাদের চোখ বুজে আসছিল। তোর নানি গভীর ঘুমে। তোর মা-খালারও চোখ ভরা ঘুম। অনেক কষ্টে ওরা কোটরগত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। একটা গাঁটরি মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পেট ভরা খিদে। নিমেষেই আমি ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম।

প্রায় একঘণ্টা পর তোর মামা আমাদের নিতে এলো। সঙ্গে একজন নেতা গোছের লোক। নাম আবদুল করিম। লোকটা শরণার্থীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করে থাকেন। এরই মধ্যে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম।

আবদুল করিম আমাদের আশ্বস্ত করে বলল, 'আর কোনো চিন্তা নেই চাচাজান। এখানে থাকতে কিছু কষ্ট হলেও অন্তত জীবনের নিশ্চয়তা পাবেন।'

বলে লোকটা একটা গাঁটরি তার নিজের মাথায় তুলে নিলো। বলল, 'আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

আমরা লোকটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছি। দুপাশে গিজগিজ করছে লোকজন। পথে পথে ভাসমান দোকানপাট, ফেরিওয়ালা। কেউ কেউ সওয়াব লাভের আশায় কলসি ভরে জল নিয়ে তৃষ্ণার্ত মানুষদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ আবার কাগজের ঠোঙায় করে শুকনো খাবার বিলি করছে। ওসব খাবার নিয়ে মানুষের মধ্যে সে কী কাড়াকাড়ি!

আবদুল করিম আমাদের একরুমের একটা ঘরে নিয়ে উঠালো।

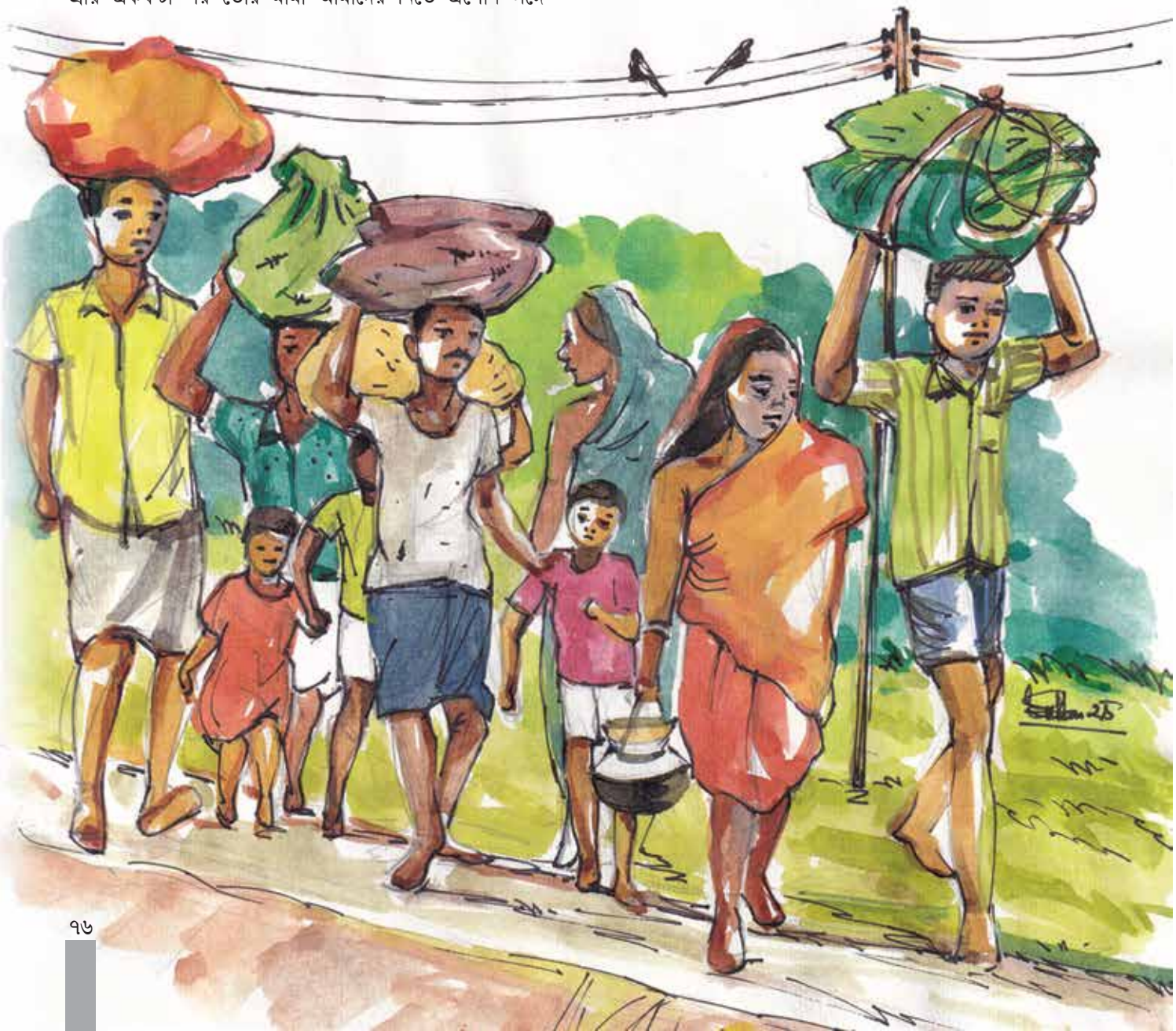

বলল, 'এখন থেকে আপনারা নিজের মনে করে এই ঘরটাতে থাকবেন। লঙ্গরখানায় গিয়ে নিজ দায়িত্বে খাবার সংগ্রহ করবেন। ঐ পাশে একটা টিউবওয়েল আছে। ওখান থেকে জল সরবরাহ করবেন। টিউবওয়েলের পাশেই একটা গণ-টয়লেট আছে। সুযোগমতো ব্যবহার করবেন।'

বলে লোকটা অন্য শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য চলে গেল। তোর মামা দুদিন আমাদের সঙ্গেই ছিল।

দুদিন পর ছোটন বলল, 'বাবা আমাকে আজ যেতেই হবে। তোমাদের জন্য অন্তত মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা তো করতে পারলাম। এখন আমি নিশ্চিন্তমনে যুদ্ধ করতে পারব। আমার জন্য দোয়া করো বাবা।'

তারপর সে তোর নানিকে সালাম করে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। ওর যাত্রা মুহূর্তে আমি বললাম, 'মনে সাহস রাখিস বেটা। জন্ম-মৃত্যু আল্লাহপাকের হাতে। মৃত্যুকে ভয় পেলে চলবে না। বাংলাদেশ স্বাধীন করে তবেই আমাদের নিতে আসিস। এর আগে নয়।'

চোখভরা জল নিয়ে আমি ওকে বিদায় দিলাম। তোর মামাও চোখে জল নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওয়ানা দিলো।

লালপানি শরণার্থী শিবিরে আমরা বলা যায় মোটামুটি ভালোই ছিলাম। খারাপ বলে তো কোনো লাভ নেই। খারাপ-ভালো যাই হোক আমাদের যে ওখানে থাকতেই হবে। অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তবু মাঝেমধ্যে কিছু কিছু দৃশ্য দেখে মনটা হুহু করে উঠত।

প্রতিদিন আমি একটা বোল হাতে নিয়ে লঙ্গরখানার লাইনে গিয়ে দাঁড়াতাম। ওখানে প্রতিদিনই খিচুড়ি রান্না হতো। যে লোকটা খিচুড়ি বণ্টন করত, সে আমাকে জিজ্ঞেস করত, 'কতজন চাচা?'

আমি বলতাম, 'চারজন।'

তখন লোকটা চারজনে খাওয়ার মতো খিচুড়ি দিত।

চারজনের খিচুড়ি নিয়ে আমি আমাদের এক রুমের চাপড়া ঘরে ফিরতাম। প্রতিদিন দুবেলা আমাদের খাবার দেওয়া হতো। সকালে আর সন্ধ্যার পর। দুপুরে খাবার দেওয়া হতো না। ওখানে আমাদের কোনো প্রকার কাজকর্ম করতে হতো না। শুধু খাওয়া আর ঘুমানো। দুপুরে আমরা ঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমাতাম।"

এটুকু বলে নানাভাই অর্কের দিকে একবার তাকালেন। তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। অর্ক কিছু বুঝতে পারল না। এতক্ষণ সে তন্ময় হয়ে নানাভাইয়ের যুদ্ধদিনের গল্প শুনছিল। সে যত শুনছিল ততই তার কান্না পাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশের মানুষ কতই না কষ্ট করেছে! ভেবে তার চোখের কোণে জল জমা হলো। কান্নাও পেল। চোখের জল মুছে সে বলল, 'তারপর কী হয়েছিল নানাভাই!'

নানাভাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে 'থ' হয়ে গেলেন। বললেন, 'তুই কাঁদছিস নাকি রে!'

অর্ক মুখে কিছু বলতে পারল না। শুধু মাথা ঝাঁকালো।

নানাভাই বলতে লাগলেন, "ভারতের বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রায়ই আমাদের জন্য সাহায্য আসত। বিভিন্ন এনজিও, বিদেশি সংস্থা, সংগঠনের পক্ষ থেকেও সাহায্য আসত। বিশেষ করে গান্ধি ফাউন্ডেশন ও রেডক্রসের অবদানের কথা আমি আজীবন মনে রাখব। লালপানি শরণার্থী শিবিরে প্রথমে আমরা যে সমস্যায় উপনীত হলাম, তা হলো অ্যানোফিলিশ স্ত্রী মশার কামড়। দিনে-রাতে সর্বদা ক্ষুধার্ত মশারা ঝাঁক বেঁধে এসে ক্ষুধার্ত মানুষকে কামড়ায়। মশার কামড়ে একসময় শিবিরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলো। কাঁপুনি দিয়ে শরীরে জ্বর আসত। আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত। একসময় পরিস্থিতি এমন হলো যে, দৈনিকই কয়েকশো মানুষ ম্যালেরিয়ায় মারা যেত। পরবর্তীতে বর্ষাকাল শুরু হওয়ায় ম্যালেরিয়া থেকে এক প্রকার রক্ষা।

লালপানি শরণার্থী শিবিরে টিউবওয়েলগুলোর পানি ছিল লালচে রঙের। আয়রন মিশ্রিত। পানি পান করে মন ভরত না। তেষ্টা মিটত না। থাকা-খাওয়া যেমন তেমন, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল বড়োই অপ্রতুল। তাই লোকজন যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করতে শুরু করল। ফলে মাসখানেকের মধ্যেই শিবিরটাকে বসবাসের অনুপযোগী করে তুলল। এতে করে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কাটতে না-কাটতেই গণহারে কলেরা, আমাশয় দেখা দিলো। ওসব রোগে প্রতিদিনই মানুষ মারা পড়তে লাগল। কোনো কোনোদিন তিন চারশো মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এসব মৃতদেহ কবর দেওয়া এবং দাহ করা দুটোই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পরবর্তীতে অবশ্য বিশুদ্ধ জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেককে কলেরা-বসন্তের টিকা প্রদান করা হলো। ফলে কলেরা-বসন্তের প্রাদুর্ভাবও কমে এলো।

এদিকে বাংলাদেশ যখন প্রায় স্বাধীন হওয়ার পথে, তোর নানি একদিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল। তাকে ধরাধরি করে অস্থায়ী হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তার দুর্বল শরীর অসুখের ধকল সইতে পারল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই তোর নানি চিরবিদায় নিয়ে অনন্ত মুক্তি লাভ করল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর শুনে খুশিতে মনটা ভরে গেল। আমাদের দেশে ফিরতে আর কোনো বাধা নেই। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। পৃথিবীর মানচিত্রে যুক্ত হলো 'বাংলাদেশ' নামের নতুন একটা দেশ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছোটন একদিন আমাদের নিতে এলো। তখন আমাদের মনে বাড়ি ফেরার যে কী আনন্দ জেগেছিল, তোকে বলে বোঝাতে পারব না রে নানাভাই। মনে পড়ে গরুর গাড়িতে চড়ে আমরা জন্মভূমির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলাম। পথ চলতে চলতে হঠাৎ আমার মনে পড়ল, কোনো এক ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আমরা পাঁচজন মানুষ প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম। লালপানি শরণার্থী শিবির আমাদের মায়ের মতো আপন করে বুকে আগলে নিয়েছিল। তাই আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। আজ আমরা মায়ের সেই প্রিয় কোল ছেড়ে আপন ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছি। তবে একসঙ্গে পাঁচজনের আর ফেরা হলো না। ফিরলাম চারজন।"

কথাটা বলে নানাভাই হুহু করে উঠলেন। গামছার কোনায় চোখ মুছলেন।

একাত্তরের আগুন ঝরা মার্চ

পৃথ্বীশ চক্রবর্তী

পাকিস্তানির কূটচালগুলো করতে পেরে আঁচ
অগ্নি বৃষ্টি করলো শুরু একাত্তরের মার্চ।
ষড়যন্ত্র করল শুরু হায়েনাদের দল
২৫শে মার্চ রাত্রি থেকে ছুঁড়ল দাবানল।
হত্যাযজ্ঞ করলো শুরু নির্বিচারে তারা
বাঙালিরা এসব দেখে বেবাক-দিশেহারা।
২৬শে মার্চ দেয়া হলো যুদ্ধে যাবার ডাক
সাথে সাথেই বাঙালি দেয় বীরের মতন হাক।
যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ হাতে রেখে হাত
হায়েনাদের ঘায়েল করে, বিরাট প্রতিঘাত।
বাঙালিরা শুরু করলো জলে, স্থলে রোধ
পাক-সেনানীর ওপর নিলো চরম প্রতিশোধ।
বাঙালিরা বীরের জাতি নেয়নি মেনে হার
অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে পরলো জয়ের হার।

দেশটা আমার

মিজানুর রহমান

দেশটা আমার, দেশটা তোমার
দেশটা আমার ভাইয়ের
দেশটা কুলি-দিনমজুরের
দেশটা আমার মায়ের।

ছোটোবড়ো দেশটা সবার
দেশটা তরুলতার
দেশটা হলো পাখপাখালির
মিষ্টি সুরে গাওয়ার।

স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা
দেশটা সবার তরে
মুক্ত এ দেশ সোনার এ দেশ
দেখলে হৃদয় ভরে।

ঈদের নতুন চাঁদ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

রোজার শেষে উঠল হেসে
ঈদের নতুন চাঁদ,
ঈদের খুশি ঘরে ঘরে
জাগব সবাই রাত।

অপেক্ষাতে রাত্রি কেটে
হবে যখন ভোর,
খুশি মনে সবাই তখন
খুলব ঘরের দোর।

গোসল সেরে পরব তখন
নতুন জামা গায়,
মাখব আতর গায়ে পরা
নতুন জামাটায়।

ঈদ-জামাতে যাব সবাই
হাসিখুশি দিল,
ধনী-গরিব নয় ভেদাভেদ
কী চমৎকার মিল!

সিয়ামের এ মাস

এম. আলমগীর হোসেন

বছর ঘুরে এলো দ্বারে
সিয়ামের এ মাস,
দিনেরাতে এবাদতে
পুণ্যেরই উচ্ছ্বাস।

এই মাসে প্রথম দশে
রহমত হয় পূর্ণ,
বান্দার যত গুনাহ ক্ষত
দ্বিতীয় দশে চূর্ণ।

শেষ দশে নাজাত আসে
দোজাহানের মুক্তি,
সকল কাজে যেন বাজে
প্রভুর সাথের চুক্তি।

পড় কোরান হে মুসলমান
হও খাঁটি বান্দা,
রোজা হতে সুফল পেতে
ছাড়ো মন্দ ধান্দা।

ঈদ

আহসানুল হক

সাঁঝ আকাশে শাওয়াল মাসে
যেই দিলো চাঁদ উঁকি
খুশির হ্রদে ভাসে সবাই
সকল খোকাখুকি!

'ঈদ হবে কাল, ঈদ হবে কাল'
হৈ-হুল্লোড়ে মাতে
খুলবে যে ভাঁজ নতুন জামার
ঈদ সকালে-প্রাতে!

খুশবু-আতর মেখে গায়ে
ঈদগাহতে যাবে
জর্দা-পায়েস, কোপ্তা-কাবাব
মিলে সবাই খাবে!

বলবে না মা, 'পড়তে বসো'
বাবার কঠিন শাসন
সব উবে যায় ঈদের দিনে
সব হৃদয়ে আসন!

হয় সকলে কেমন উদার
দেয় সেলামি হাতে
কী আনন্দ! কী আনন্দ!
কী আনন্দ তাতে!

চাঁদের হাসি

আলমগীর কবির

চাঁদ দেখবার জন্য সবাই
দূর আকাশে তাকিয়ে ছিল,
চাঁদ আকাশে কে এঁকেছেন
কোন সে নিপুণ আঁকিয়ে ছিল?
এলোমেলো মেঘের নদী
তার কিনারে টলটলে কী?
মায়ের মুখের হাসির মতো
হাসছে ওটা ঝলমলে কী?
আকাশ কোণে এক ফালি চাঁদ
খুশির আলো ছড়িয়ে দিলো,
সেই না খুশি খোকাখুকির
মন আলোতে ভরিয়ে দিলো!
মলিন মুখে খানিক দূরে
একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল,
খোকন তখন বলল এসো
হাত দুটি তার বাড়িয়ে দিলো,
সেই ছেলেটার মুখের হাসি
চাঁদকে তখন হারিয়ে দিলো!

মহান করেছেন দান

আব্দুল আওয়াল রণী

রোজা করো, নামাজ পড়
মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করো।
এই মহাসুযোগ বরণ করো,
অনন্ত সুখের জীবনকে হাসিল করো
যখন থেকে জীবন যৌবন পেলাম
নানা চাওয়া-পাওয়ায় হাত বাড়ালাম
কত যে, লোভ লালসার শিকার হলাম
নানা পথের অন্যায় অপরাধের শিকার হলাম।
জীবন যখন পেলাম শিক্ষার জন্য বাতিঘরে গেলাম
বাতিঘরের আলোতে আলো গ্রহণ করলাম,
সেই আলো ধরে কর্মজীবন ধরলাম
পরিবারের মা-বাবার মতো সংসার জীবন গড়লাম।
এই যুগের ধারায় সবাই আমরা শিক্ষিত
কতক বিদ্যা ঘরের বিদ্যার আলোয়
কতক কর্মজীবনের কর্মের ধারায়
কতক অনাথ-অসহায় ভিখারি ধারায়।
আমরা মানবজাতি করে এসেছি পণ
ভুলবো না পৃথিবীতে পেয়ে জীবন।
স্রষ্টা তোমার সর্ব বিধি-বিধান
জীবন যতক্ষণ করবো রীতিমতো পালন।
মহান সৃষ্টিকর্তার যে শিক্ষা করে এসেছি বরণ
সেই শিক্ষারই আলো মসজিদ মক্তবে করেছে স্মরণ
সেই আলোই নামাজ রোজা হজ জাকাত করতে পালন
কর্মজীবনের উৎসব বোনাস তেমনি সিয়াম সাধন
মহান করেছেন দান।

চলে গেলেন সেক্টর কমান্ডার কে এম শফিউল্লাহ

এইচ কে রায় অপু

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, মুক্তিবাহিনীর তিনটি বিশেষ ইউনিটের একটি, 'এস ফোর্স'-এর কমান্ডার ও বাংলাদেশের প্রথম সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ ২৬শে জানুয়ারি ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। 'দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তার অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর বীরগাথা আজীবন চিরকৃতজ্ঞে স্মরণ করবে', শোকবার্তায় বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

কাজী মুহাম্মদ শফিউল্লাহর জন্ম নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ১৯৩৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া হাইস্কুল থেকে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন তিনি। মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে পড়া অবস্থাতেই যোগ দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৯৫৫ সালে কমিশন পান তিনি। এরপর ১৯৬৮ সালে ডিফেন্স স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি করেন। তিনি স্কুল অব ইনফেন্ট্রিতে প্রশিক্ষক ছিলেন। ১৯৭০ সালে পদোন্নতি পেয়ে আবার ব্যাটেলিয়নে ফিরে আসেন কে এম শফিউল্লাহ।

মুক্তিযুদ্ধে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে এম শফিউল্লাহ ছিলেন নেতৃস্থানীয় ভূমিকায়। মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে ১৯শে মার্চ ঢাকার ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে জয়দেবপুরে যান ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবা। বাঙালি সেনাদের তারা নিরস্ত্র করতে ব্যর্থ হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৮শে মার্চ তাঁর নেতৃত্বে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১০ই এপ্রিল থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত ৩ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন কে এম শফিউল্লাহ। মুক্তিযুদ্ধের অক্টোবর মাসে তার নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয় এস ফোর্স। এই ফোর্সের অধীনে ছিল ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ১১ নম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। কে এম শফিউল্লাহর নির্দেশে ও নেতৃত্বে অসংখ্য দুর্ধর্ষ ও সফল অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'বীর উত্তম' খেতাব পান।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৫ই এপ্রিল সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে এম শফিউল্লাহ। তখন তাকে পূর্ণ কর্নেল পদমর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং একই বছরের ১০ই অক্টোবর মেজর জেনারেল পদ লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি সেনাপ্রধান ছিলেন। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে দেশে ফিরে আসেন। পরের বছর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে নারায়ণগঞ্জ ১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

মুক্তিযুদ্ধের জীবিত সেক্টর কমান্ডারদের নিয়ে ২০০৭ সালে সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম গঠিত হলে শফিউল্লাহ হন সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। পরে তিনি এ সংগঠনের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন।

সেনাবাহিনীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ২৬শে জানুয়ারি বাদ জোহর দুপুর সোয়া দুইটায় তাঁর জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে কাজী আব্দুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গার্ড অব অনারের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় বীরের প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বাদ আসর বনানী কবরস্থানে তাঁর দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টাসহ সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। আমরা তাঁর বিদেহি আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

26 March
Independence and National Day of Bangladesh
2025

Ministry of Information and Broadcasting
Government of the People's Republic of Bangladesh

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 09, March 2025, Tk. 25.00

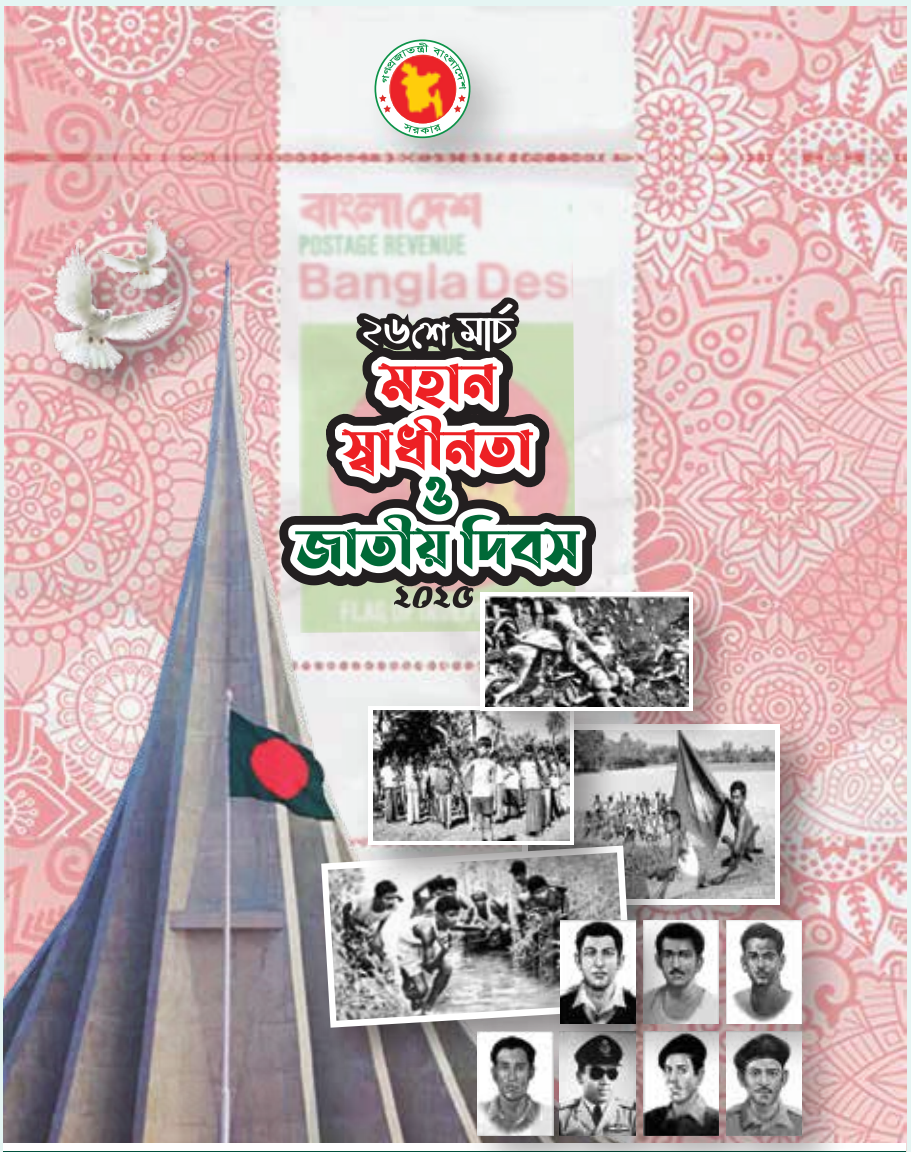

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd